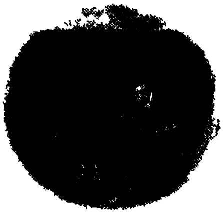
অন্য মনের খোঁজে



পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৬৫

প্রচ্ছদ
সায়ন চক্রবর্তী

• •

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, ক
লকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

সব্যসাচী তালুকদার

অগ্রজপ্রতিমেষু

গাছের শুকিয়ে যাওয়া ত্বকের দিকে তাকিয়ে বারবার মনে হয়েছে এর শরীর তো একদিন সবুজ ছিল। তখন সেখানে ছিল কত স্পন্দন। কত অনুভব। মানুষের মনও এমনই। কিন্তু গাছের শরীর শুকিয়ে গেলে যেমন সব সবুজ হারিয়ে যায়, মনেরও কী তাই হয়? জীবনে চলার পথে কত মানুষের মুখ ভেসে আসে চোখে। কিছু মুখ ভাসতে-ভাসতে চোখের ভেতর দিয়ে আটকে যায় মনে। তখন যে তাকে দেখছিল, সেই ডুবে যায় তার ভেতরে। তেমনই ডুবতে-ডুবতে একজনের মধ্যে দেখেছিলাম এক অদ্ভুত ঘটনা। বুঝেছিলাম গাছেদের মতো হয় না মনের অবস্থা। বয়স তাঁর শরীরে শুষ্কতা এনেছে ঠিকই। কিন্তু আনতে পারেনি মনে। সেই মধ্যবয়সি মনের পরতে-পরতে কত বিচিত্র সব খেলা। সেই খেলা আর খেলায় যুক্ত হয়ে পড়া মানুষজনদের নিয়েই এই উপন্যাস। পাঠকের ভালো লাগলে আমারও ভালো লাগবে।

ছিঃ ছিঃ। প্রেম করার জন্যে আর লোক খুঁজে পেল না রিমি! শেষ পর্যন্ত ওল্ড হ্যাগার্ড সুব্রত রায়! মাল খেয়ে-খেয়ে এই চুয়াল্লিশেই গালে মেচেতার দাগ ফেলে দিল, দাঁতও বোধহয় নড়ে এক-আধটা, রোজ শেভ না করলে ওই মুখের দিকে তাকানোই যায় না, আর তাকেই কিনা...। অনিন্দিতা ঠিক দেখেছে তো? খবরটা পেয়ে প্রাথমিক ধাক্কাটা এত জোরে খেয়েছে কাবেরী যে অন্য কোনওভাবে ভাবতে পারেনি ঘটনাটাকে নিয়ে। মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো পাক খেতে শুরু করেছে। শেষমেশ থাকতে না পেরে বুক সেলফের পাশে রাখা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল।

ফোনে ও-প্রান্ত থেকে অনিন্দিতার বিরক্তিপূর্ণ উত্তর ভেসে এল, আমি কি তোর মেয়েকে এই প্রথম দেখলাম! আর সুব্রতবাবুকে তো তোদের বাড়িতে আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি, আমার চিনতে ভুল হবে!

অনিন্দিতা কাবেরীর কলেজ জীবনের বান্ধবী। দুজনেরই বাসন্তীদেবী কলেজ। বাপেরবাড়ি একই পাড়ায়। সেলিমপুরে। কাবেরী বিয়ে হওয়ার পরে চলে এসেছে কালীঘাটে। অনিন্দিতার বিয়ে হয়েছে ডোভারলেনে। বাপেরবাড়ি গেলে রাস্তায় অনিন্দিতার

সঙ্গে দেখা হয়েছে কাবেরীর। যোগাযোগটা থেকে গেছে তাই। রিমির জন্মদিন, তাদের বিবাহবার্ষিকী—এরকম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনিন্দিতা সপরিবারে এসেছে তাদের কালীঘাটের ফ্ল্যাটে। তারাও গেছে ডোভারলেনে। ফলে দুই বাড়ির লোকেরা দুই বাড়ির অনেককেই চেনে। কাবেরী বুঝতে পারছে অনিন্দিতার ভুল হওয়ার কথা নয়। কী বলবে কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না।

কাবেরী চুপ করে থাকায় অনিন্দিতা বিরক্ত হয়ে বলল, কিরে চুপ করে আছিস কেন! তুই আবার ভাবছিস নাকি কোনও জেলাসি থেকে তোর মেয়ের নামে গল্প বানাচ্ছি?

—ধ্যাৎ আমি কী তাই বলেছি।

—তাহলে চুপ করে রয়েছিস?

—কী করি বলত? কাবেরীর গলা ধরে এ৽, হাত পায়ের মধ্যে কীরকম একটা চিনচিন করা ভাব ভেসে উঠছে।

অনিন্দিতা বলল, শোন অত নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই। সমস্যা যখন হয়েছে তখন সমাধান নিশ্চই একটা আছে, বসে ঠান্ডা মাথায় ভাব, আর একটা কথা, রিমিকে কিন্তু এখন কিছু বলবি না, ঠিক আছে?

—কী হল?

—ঠিক আছে, বলব না।

—কথা দিচ্ছিস কিন্তু।

কাবেরী কথা দিল।

রিসিভার নামিয়ে রাখার পরে কাবেরীর মনে হল তার মাথার ওপরে কে যেন একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। নিশ্বাস নিতে

কষ্ট হচ্ছে। বিছানার ওপরে ছেড়ে দিল নিজেকে। হাত বাড়িয়ে দেওয়ালের বুকে এ.সি-র রেগুলেটারটা ঘুরিয়ে দিল। শুধুমাত্র খবরের কাগজের শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনেই নয়, ইন্টারনেটের ম্যাট্রিমোনিয়াল ডট কমেও রিমির জন্যে পাত্রের খোঁজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে তারা। মেয়ে তাদের লাখে এক। প্রথমে ক্যালকাটা গার্লস, তারপরে প্রেসিডেন্সিতে পড়াশোনা করেছে। এই কালীঘাট থেকে ওই ক্যালকাটা গার্লস বা প্রেসিডেন্সি তো আর কম রাস্তা নয়। মেয়ে ধকল সহ্য করেছে। ফার্স্ট ইয়ারে ওঠার আগে পর্যন্ত মেয়ের মা-ও ধকল সহ্য করেছে। এত কষ্ট করে বড় করার পরে সেই মেয়ে শেষপর্যন্ত কিনা বাঁদরের গলায় ঝুলে পড়বে! বাঁদর বললেও ভুল হয়। বুড়ো বাঁদরের গলায়।

ছোট বয়স থেকে এত ধকল গেলেও ঈশ্বরের উদারতায় পাতা ছাড়তে থাকা গাছের ডালের মতো তরতরিয়ে বেড়েছে রিমি। এতে অবশ্য বাবা-মায়ের চিন্তাই বাড়িয়েছে। রাস্তায় রিমিকে নিয়ে হাঁটার সময় যেসব দৃষ্টি ভেসে আসে তা তো চিন্তারই। তবু কোথায় যেন এ নিয়ে কাবেরীর ভিতরে একটা ক্ষীণ অহঙ্কারও আছে। সেই মেয়ে আবার আমেদাবাদ থেকে ফ্যাশান ডিজাইনিঙের ওপরে ডিগ্রি করেছে। তা হলেও নয় হতো, এরইসঙ্গে তিনমাস হল বাইশ হাজার টাকা মাইনের চাকরি করছে। সেই চাকরি আবার ভালো লাগছে না বলে এখন বাড়িতে। কোম্পানি থেকে প্রায়ই অনুরোধ আসে জয়েন করার জন্যে। একান্ত যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তোমার কাজ, মানে ডিজাইন পাঠাও। কোম্পানির অনুরোধে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মাঝে-মাঝে ডিজাইন পাঠায়। তার বিনিময়ে যেসব অঙ্কের

চেক আসে তা দেখে শুধু কাবেরীরই নয়, রিমির বাবা শুভেন্দুর চোখও কপালে উঠে গেছে। তাহলে এহেন রিমির জন্যে তো রাজপুত্রের দরকার। আর সেই রাজপুত্র খোঁজার ব্যাপারে রিমি তাদের একটা বিরাট বাঁচান বাঁচিয়ে দিয়েছে। নিজে থেকে কোনও রাজপুত্র পছন্দ করে রাখেনি। মনের সুখে তাই রাজপুত্র খুঁজছে কাবেরী আর শুভেন্দু। কিন্তু শেষমেশ এই খবর এল অনিন্দিতার কাছ থেকে!

মাথা ঘুরছে কাবেরীর। বাড়িতে এখন শুভেন্দুও নেই যে আলোচনা করবে। এর থেকে পেশিবহুল হিন্দিছবির ভিলেনমার্কা ছেলেটাও যে ভালো ছিল। তাকে অবশ্য শুভেন্দু বা কাবেরী কারুরই পছন্দ নয়। কিন্তু ছেলেটার রিমিকে খুব পছন্দ। আমেদাবাদ থেকে ফ্যাশান ডিজাইনিঙের কোর্সটা কমপ্লিট করার দিন দশেকের মাথায় পুণার 'নিউওয়েভ গার্মেন্টস'-এ জয়েন করে রিমি। চাকরির প্রথম তিনমাসের মধ্যে ছুটি নেওয়া যায় না ওখানে। তবু রিমি নিয়েছিল। ওরা দিয়েও ছিল। এক সপ্তাহের জন্যে বাড়িতে আসে রিমি। তখন ওর মোবাইলটা ঘনঘন বেজে উঠত। কাবেরী জানতে চাইত কার ফোন। রিমি চোখে হেসে জানিয়েছিল, মাই বস্।

কাবেরী মানুষটার সম্পর্কে অনেক কথা জেনেছিল রিমির কাছ থেকে। রোহিত ভাটনগর। রিমির থেকে বছর সাত-আটের বড়। ওনার নতুন কেনা ফ্ল্যাট উনি রিমিকে দেখাতে নিয়ে গেছেন। আগের গাড়িটা পালটে নতুনটা নেওয়ার সময়েও নাকি নিয়ে গেছেন রিমিকে। এমনকী শুট-লেংথ কেনার সময়েও রিমিকে সঙ্গী করেছেন। এই পর্যন্ত শুনে কাবেরী বলেছিল, 'হ্যাঁ-রে লোকটা

ব্যাচেলর না ম্যারেড?' চারপাশে যা শোনা যায় তাতে তো মনে হয় এই বস্ মানুষগুলো অফিসে চাকরি করতে যায় না, যায় মেয়ে ধরতে। এরা আসলে মেয়েধরা। যেমন ছেলেধরা হয়, এরা তেমন মেয়েধরা। ব্যাচেলর শুনে মনটা একটু আশ্বস্ত হয়। যাক্ বাবা খারাপ কিছু হলেও একটা রাস্তা খোলা থাকবে। তাছাড়া ব্যাচেলরগুলো ম্যারেডগুলোর থেকে একটু কম বদমাইশ হয়।

ছুটি কাটিয়ে রিমি যখন পুণায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে কাবেরী মেয়েকে বলেছিল, ওখানে গিয়ে রোহিত ভাটনগরের একটা ছবি পাঠাস তো।

রিমি হেসে বলেছিল, হোয়াই! ছবি কেন!

কাবেরী বলেছিল, তুই যা ভাবছিস তা নয়, লোকটা কেমন বুঝতে হবে না! সারাদিন লোকটার সঙ্গে তোকে কাজ করতে হয়...

রিমি হেসে বলেছিল, তুমি ছবি দেখে বুঝে যাবে লোকটা কেমন!

ওখানে পৌঁছে অবশ্য এ-বাড়িতে রাখা রিমিরই কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে রোহিত ভাটনগরের একটা ছবি পাঠায় রিমি। ছবিটা একটুও ভালোলাগেনি কাবেরীর। কীরকম হিন্দিছবির পেশি বহুল বদমাইশ লোকগুলোর মতো দেখতে! যাদের একটাই কাজ মেয়ে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়া। অথচ এখন মনে হচ্ছে ওই মানুষটাকেও যেন রিমির পাশে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু কিছুতেই মানা যায় না ওই সুব্রত রায়কে। মানবেই বা কি করে সুব্রতকে? সুব্রত শুভেন্দুর থেকে বছর পাঁচেকের ছোট হলেও শুভেন্দুরই বন্ধু। মানে রিমির বাবার বন্ধু। বাবার বন্ধুর সঙ্গে রিমি প্রেম করছে!

বিছানা থেকে উঠে পড়ল কাবেরী। এ. সি-র হাওয়াও এখন গরম লাগছে।

তিনতলার এই ফ্ল্যাটের দক্ষিণদিকে স্বল্প দৈর্ঘ্যের বেশ চওড়া বারান্দা আছে একটা। তিনপাল্লার ভাঁজ করা কাচ লাগানো দরজা সেখানে। মাঝখানকার পাল্লাটা সবসময় খোলা থাকে। তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল কাবেরী। এখান থেকে কালীঘাট মন্দিরের চুড়ো দেখা যায়। চুড়োর ও-পাশে গ্রীষ্মের ফ্যাকফ্যাকে আকাশ। দক্ষিণের বারান্দা বলে একটা হাওয়া আসছে বটে কিন্তু তাতে কীরকম গরম ভাপ। বাতাসের ওই অদৃশ্য উষ্ণতা রিমির ভেতরে বেড়ে ওঠা উদ্বেগটাকে একটা ভয়ে পরিণত করে দিল। কাবেরীর মন বলে উঠল সম্পর্কটা কী অনেকদূর গড়িয়ে গেছে? যে-মেয়ে গুজরাটে পড়তে গিয়ে কলকাতার ধোঁয়া ধুলো ট্র্যাফিক জ্যাম-এর ভয়ে দু-তিনদিনের বেশি বাড়িতে থাকতে চাইত না, সে তো পুণার চাকরিটা ছাড়ার পরে আজ প্রায় কুড়ি-একুশ দিন হল দিব্যি রয়ে গেছে কলকাতায়! এটা কী করে হল!

সকাল-সকাল বিছানা ছাড়ে রিমি। তারপর কিছুক্ষণ ক্লাসিক্যাল সাধে। তারপর বাজারের ব্যাগ কিচেনের হুক থেকে নামিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। মর্নিংওয়াক কাম বাজার দুটোই নাকি হয়ে যায় এতে। মর্নিংওয়াকে আপত্তি নেই কাবেরীর, কিন্তু বাজার কেন! রিমি হেসে বলেছে 'ও মা! পুণায় আমার জন্যে কে বাজার করে দিত!'

এরপরেও যেটুকু আপত্তি করার ছিল কাবেরীর সেটা আর করা হয়ে ওঠেনি মেয়ের বাবার জন্যে। শুভেন্দু বলেছিল, নিজে লেডিজ-ক্লাব করছ, আর মেয়েকে বাজারে যেতে দিতে অসুবিধা!

পিকুলিয়ার। কাবেরীর বুঝেছে বাবার সমর্থন তো মেয়ে পাবেই। এই যে রিমি বাজারে যায় এতে তো শুভেন্দুর পোয়াবারো। আগে কবিতা লেখা, নিজের পত্রিকার প্রুফ দেখা, বন্ধুবান্ধবদের ফোন করা ব্যাপারগুলো অফিস থেকে ফিরে প্রায় বারোটা-সাড়ে বারোটা পর্যন্ত করত। মেয়ে বাজার যাওয়া শুরু করতে রাতের সঙ্গে সকালেও অফিসে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এইসব করে শুভেন্দু।

এরপরে রিমি স্নান সারে। কাবেরী তার লেডিজ-ক্লাব, আজকাল অবশ্য সংগঠন শব্দটা বলতে ভালো লাগে কাবেরীর, সেই কাজে বেরোনোর আগে রিমিকে খেতে দেয়। রিমি কোনওদিন খাওয়াদাওয়ার পরে নিজের ঘরে ঢুকে পি. সি-তে ফ্যাশান ডিজাইনের স্কেচ করতে থাকে মাউস ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। সেদিন বেল বাজিয়ে রিমিকে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করার সংকেত পাঠিয়ে সিঁড়ি দিয়ে বাহারি চটিতে টরেটক-টরেটক শব্দ তুলে ব্যস্ত পায়ে নেমে যায় কাবেরী। কিন্তু কোনও-কোনও দিন কাবেরীর আগেই বেরিয়ে গেছে রিমি। জিনসের প্যান্টের ওপরে লেবুরঙের হাফহাতা ডেনিমের শার্ট পরে। কাঁধের পেছনে ঝুলছে এক স্ট্র্যাপের স্যাচেল। কাবেরীর মনে হয়েছে ছোট্ট করে এক টিপ কাজল লাগিয়ে দেওয়া উচিত রিমির কপালের কোণায় চুলের আড়ালে। বছর চারেক গুজরাট আর কয়েকমাস পুণাতে থাকায় শরীরের মধ্যে কীরকম যেন একটা অবাঙালি সৌন্দর্য ডানা মেলেছে। অথচ মুখটিতে বাঙালি ভাব পুরো। নজর না লেগে যায়।

মেয়েকে কোথায় যাচ্ছ জানতে চাওয়ায় কাবেরী জানতে পেরেছে—'একটু গড়িয়াহাটে যাব। কিছু কার্ডস্ কেনার আছে।

ওখান থেকে একটু আইসকেটিং-এ, পোশাকের প্রদর্শনী হচ্ছে।'

রিমির ঘোরাফেরা নিয়ে সেরকমভাবে খোঁজখবর করার মতো কিছু খুঁজে পায়নি কাবেরী। শুধু নিজের অবচেতনে ভয় পেয়েছে রিমির দেহবল্লরীর কথা ভেবে। কখনও না একটা বিপদে পড়ে যায়।

ভিতরের ভয় ভিতরেই থেকে গেছে। ক্লাবের কাজের চাপে কাবেরী আর সেই ভয় নিয়ে বেশি ভাবতে পারেনি। ক্লাবের কাজ থেকে কাবেরী হয়তো আগেই ফিরেছে। ডোরবেলের শব্দে দরজা খুলেছে। দেখতে পেয়েছে মেয়ের খুশিতে ভরা মুখ। কী ব্যাপার? ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের মোড়ে পুরোনো রেকর্ডের দোকান থেকে কার্ল সানতানার একটা প্রিয় ডিস্ক কিনেছে। অনেকদিন ধরেই নাকি রেকর্ডটা খুঁজছিল রিমি। এভাবে পেয়ে যাবে ভাবতে পারেনি।

এরজন্যে এত উচ্ছ্বসিত হওয়ার কী আছে বুঝতে পারেনি কাবেরী। আর তারপরেই মনে হয়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের মোড়ে পুরোনো রেকর্ডের দোকান থেকে ডিস্কটা কিনেছে বলল, কিন্তু ওদিকে তো যাওয়ার কথা ছিল না রিমির। বেরোনোর সময় বলেছিল গুরুসদয় দত্ত রোডে একটা গার্মেন্টস তৈরির কারখানায় যাবে। ওরা কনসালটেন্ট হিসেবে রিমিকে পেতে চাইছে। ওদের সঙ্গে কথা সেরে পার্কস্ট্রিটে এক কম্পিউটার সার্ভিসিংয়ের অফিসে যাবে। পি. সি-র প্রিন্টারটায় সামান্য অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কাবেরী তাই রিমির পছন্দের গানের রেকর্ড খুঁজে পাওয়ার উচ্ছ্বাসটাকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে বলেছিল, ওয়েলিংটনে কী করতে গিয়েছিলিস?

রিমি অবাক হয়ে বলেছিল, তুমি তো দেখছি মা গোয়েন্দাদের

মতো বিহেভ করছ! আমার স্কুল তো ওয়েলিংটনেই, কতদিন স্কুলবাড়িটাকে দেখি না, খুব ইচ্ছে হচ্ছিল একবার দেখি। চলে গেলাম।

ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবে না কাবেরী, কেন তার রিমির কথাগুলো একটুও ভালোলাগেনি। শুধু জানে ভালোলাগা তো দূরের কথা রিমিকে ঘিরে তার মন তেতো হয়ে গিয়েছিল। বাইশ হাজার টাকার মাইনে ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে, খুব ভালো না লাগলেও ব্যাপারটার মধ্যে একটা সান্ত্বনা পেয়েছে কাবেরী—যাক্ বাবা, মেয়ে চোখের সামনে তো আছে। যা দিনকাল! চোখের সামনে থাকতে-থাকতেই যেন সঠিক ছেলের সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে দেওয়া যায়। পরে যখন দেখেছে নেটের মাধ্যমে নিজের ডিজাইন পাঠিয়ে ভালো অঙ্কের চেক পাচ্ছে রিমি, তখন মনে-মনে বলেছে যাক্, লক্ষ্মী যখন বাড়িতে বসে-বসে আসছে তাহলে বাইরে ছোটার কী দরকার।

কিন্তু এই যে কথাটা রিমি বলল, অনেকদিন স্কুলবাড়িটা দেখেনি, দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল—এইসব কথা তো আসলে লক্ষ্মীর কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া। কাবেরী তো দেখেছে এইসব নস্টালজিয়া রোমান্টিকতা ভালো-ভালো ছেলেমেয়েদের কিছু হয়ে ওঠার থেকে কতদূরে সরিয়ে দিয়েছে। রিমি কি জানে না সে কী? ওকে মানায় ওইসব তুচ্ছ ব্যাপারের জন্যে সময় ব্যয় করা, ওইসবকে ঘিরে এতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা? রিমিকে ছোট করে ধমকানোর ইচ্ছে হয়েছিল কাবেরীর। কিন্তু ধমকাবে কাকে? কাবেরী শুনতে পেয়েছিল রিমির ঘর থেকে কার্লো সানতানার মাদকভরা স্বর ভেসে আসছে। রিমির ঘরের আরও কাছে যেতে শুনতে পেয়েছে রিমি

নাচছে ওই গানের তালেতালে। এখন এসব গান কেউ শোনে না, কোন সেই ছোটবেলায় তারই সংগ্রহ থেকে প্লেয়ারে বাজানর সময় রিমি শুনেছে। তা নিয়ে এই বয়সে এসে এতো মাতামাতির কী আছে? কিছু বুঝতে না পারার জন্যেই বোধহয় রিমিকে ডাকতে পারেনি। জড়াতে পারেনি কোনও তর্কে।

আজ সেইসব কথা মনে পড়ার মধ্যে দিয়ে কাবেরী বুঝতে পারছে রিমিকে ঘিরে সেদিন বা তারও পরে যেসব রাগ তার বুকের মধ্যে জেগে উঠেছে সেগুলো আসলে খুব বোকাবোকা ঘটনা। অন্ধ ষাঁড়ের মতো লোহার দেয়ালে শুধু গুঁতিয়ে গেছে। কোথায় গুঁতচ্ছে, আসল জায়গাটা ঠিক কোথায়, কিছুই বোঝেনি। ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের পুরোনো রেকর্ডের দোকানে কার্ল সানতানার রেকর্ড খুঁজে পাওয়ার মতো কাবেরী জেনেছে হাতিবাগানের কাছে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের যেমন ক্রেশ থাকে তেমন তিনমাস বয়স পর্যন্ত কুকুরদের ক্রেশ আছে। কাবেরী রেগে গিয়ে বলেছিল, তাদের জামাকাপড়ের অর্ডার নিতে গিয়েছিলে?

রিমি হেসে বলেছিল, ও মা তা কেন! তুমি জানো কুকুরের বাচ্চা কিনলে কত অসুবিধা, ধরো তুমি পনেরো দিনের জন্যে বেড়াতে যাচ্ছ, কি করবে? তাদের যাতে কোনও প্রবলেম না হয় সেইজন্যে ক্রেশটা করা।

কাবেরী রাগবে কি! রাগে বোবা হয়ে গিয়েছিল।

আরেকদিন জেনেছে বাগনানের ফুলের বাজারে একজন আছে যে শুধু কালোগোলাপ বিক্রি করে। কাবেরী রেগে গিয়ে জিগ্যেস করেছিল, সেটা কেনে কারা? সেইসব পাগলদের নাম কী?

রিমি চোখ বড়-বড় করে বলেছে, পাগল বলছ কী! দে আর সেলিব্রেটিজ, ইউ নো। না হলে একজন ফুল বিক্রেতার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্যে টি. ভি চ্যানেল যায়! এই ধরনের কথাগুলো শুনতে-শুনতে কাবেরী শুধু রাগ করেছে একটা কথা ভেবে—রিমি ইজ ওয়েস্টিং হার ভ্যালুএবেল টাইমস্ অ্যান্ড নাথিং এলস্। কিন্তু আজ বুঝতে পারছে চরম মূর্খের মতো আচরণ করেছে। এরকম না ভেবে যদি এরকম ভাবে ভাবত—ওই যে কুকুরের ক্রেশে যাওয়া, বাগনানের ফুলবিক্রেতার সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়া, এসব করতে গেলে তো কলকাতার ধোঁয়া ধুলো যানজট মাখতে হচ্ছে রিমিকে, অথচ একটা বছর আগে যখন রিমির গুজরাটে পড়া শেষ হয়নি তখন কলকাতায় এলে এইগুলোর দোহাই দিয়ে দু-তিন দিনের বেশি থাকেনি। তাহলে মাত্র একটা বছরের ব্যবধানে সেগুলো সহ্য হয়ে গেল কী করে? এসব বস্তু তো সহ্য হয় যদি পাশে তেমন সঙ্গী থাকে। তখন ধোঁয়া ধুলো যানজট খুব একটা গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না।

কাবেরী দেখেছে খানাখন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে আসার সময়ে বা খুব ট্র্যাফিক জ্যামে পড়লেও অসুবিধা হয় না যদি একজন ভালো কথা বলিয়ে মানুষ সঙ্গে থাকে। যাই হোক যদি এভাবে ভাবত তাহলে তো ওইসব ভুলভাল রাগের বদলে মাথায় একটা কথাই ভেসে উঠত। কে সেই সঙ্গী যে মাছের বড়সড় মুড়োর মতোই রিমির মাথাটা তারিয়ে-তারিয়ে চিবচ্ছে? যার জন্যে অসহ্য ব্যাপারও রিমির সহ্য হয়ে যাচ্ছে? খোঁজ করতে শুরু করলে নিশ্চই তাকে খুঁজে পেত কাবেরী। তাহলে কী আর অনিন্দিতার মুখ থেকে জানতে

হতো সুব্রত রায়ের নামটা। এতদিনে রোগ নির্ণয়ের পরে রোগ নির্মূল করে ফেলতে পারত। এখন কী করবে! ঘটনা কতদূর এগিয়েছে বুঝবে কি করে?

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কালীঘাট মন্দিরের চুড়ো দেখতে পাচ্ছে কাবেরী। পেছনে ফ্যাকফ্যাকে অভিব্যক্তিহীন আকাশ। তারও ওপরে দৃষ্টি আটকে কেঁদে ফেলল কাবেরী। মনে-মনে বলে উঠল, মা এভাবে তুমি আমার ভাবনাটাকে ভুল দিকে নিয়ে গেলে! কী অপরাধ করেছিলাম আমি! তুমি তো জানো মা রিমিকে ঘিরে আমার কত স্বপ্ন। তুমি তো আমার বুদ্ধিটা সঠিক দিকে খেলাতে পারতে। চোখ মুছতে-মুছতে কাবেরীর মনে পড়ল অনেকদিন পুজো দেওয়া হয়নি। কালই একটা পুজো দিয়ে আসবে।

ব্যালকনি থেকে ডাইনিংয়ে ফিরে এল কাবেরী। মা-কে পুজো দেবে সে তো ঠিক আছে কিন্তু মায়ের ক্রিয়াকাণ্ড তো খুব দ্রুত হবে না। মায়ের তো সময় লাগবে। ঠিক এই মুহূর্তে কী করবে। ভিতরটা যে কিছুতেই স্থির হতে চাইছে না। অনিন্দিতার ফোনটা না এলে এতক্ষণে কাবেরী বেরিয়ে পড়ত। আজ মনোহরপুকুর রোডে দীপালিদির বাড়িতে বসার কথা। দীপালিদির বোনের মেয়ে একটা বখাটে বেকার ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে। আইনের দিক দিয়ে কোনও ফাঁক নেই। অন্য কোনও ভাবে মেয়েটা আর ছেলেটাকে জব্দ করা যায় কিনা সেই ব্যাপারে আলোচনা আছে।

ভাগ্যিস অনিন্দিতা তার লেডিজ ক্লাবের সদস্যা নয়। এক্সক্লুসিভলি ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। না হলে তো পাঁচকান হতে পাঁচ

মিনিটও লাগত না। কেউ না-কেউ মুখের ওপরে বলেই দিত অন্যের মেয়ের প্রবলেম সলভ করতে এসেছ আর নিজের মেয়ে কী প্রবলেম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা জানো কি?

যত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে, মাথার ভিতরে চায়ের জল ফুটতে থাকছে। দাঁতে দাঁত চেপে বিরবির করে উঠল কাবেরী, এক্ষুনি শুভেন্দুকে একটা ফোন করা উচিত। ওই সুব্রত রায়, ওল্ড হ্যাগার্ড, এই বাড়িতে ওকে এনট্রি দিয়েছে কে? ওই শুভেন্দু। কি-না ভালো প্রুফ দেখতে পারে। আরে বাবা প্রুফ দেখতে পারে তো দেখুক না, যত খুশি, বারণটা করছে কে! প্রেসে বসে দেখলেই হয়। তা নয় বাড়িতে বসে কাপের পর কাপ চা উড়িয়ে প্রুফ দেখা হচ্ছে। পাঁচ লাইন প্রুফ দেখা হলে ছ'লাইন কবিতা পাঠ হচ্ছে, ছ'লাইন কবিতা পাঠ হলে সাত লাইন পরনিন্দা পরচর্চা হচ্ছে। বোঝো এবার পিরিতির ফল। তোমার বাড়িতে বসে শুধু কাপের পর কাপ চা খাওয়াই নয় এবার তোমার মেয়েটাকেও খাবে ওই সুব্রত রায়। তখন কোথায় থাকবে প্রুফ দেখা, কবিতা পাঠ, পত্রিকা প্রকাশ? কাবেরীর মনে হল এক্ষুনি একবার শুভেন্দুর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

নিজের মোবাইলে নম্বর টিপে শুভেন্দুকে ধরার চেষ্টা করল কাবেরী। বাজছে আর বারবার করে বলছে সাবস্ক্রাইবার ইজ বিজি, প্লিজ কল আফটার সাম টাইম। মানে কল ডাইভার্ট করে রেখেছে। কি রাজকার্য করছে! বাজে তো পৌনে চারটে। এইসময় তো ওদের ব্রাঞ্চের হলিডেহোম বুকিংয়ের খাতা খুলে বসে শুভেন্দু। চা সিগারেট আর খোশগল্পের সময় তাহলে কল ডাইভার্ট কেন? রেগে গিয়ে

নিলাদ্রীকে ধরার চেষ্টা করল কাবেরী। নিলাদ্রী শুভেন্দুর অফিসের বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের। এই ফ্ল্যাটে এসেছে অনেকবার। শুভেন্দুর বলা আছে এমারজেন্সি প্রবলেম থাকলে ওকেও তুমি ফোনে ধরতে পার নিঃসঙ্কোচে। আজ তো কাবেরীর জীবনের সবচেয়ে বড় এমারজেন্সি। দু-বারের চেষ্টায় ধরা গেল নিলাদ্রীকে। কাবেরী বলল, শুভেন্দু কোথায়?

—কেন অফিসেই আছে। তারপব হেসে বলল, এ কী আপনার তো গোয়েন্দাগিরির হ্যাবিট ছিল না।

নিলাদ্রীর রসিকতাটা ভালো লাগল না কাবেরীর। একটু গম্ভীর স্বরে বলল, না ওর মোবাইলে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি, পাচ্ছি না।

—ও। এনিথিং রং?

—না-না সেরকম কিছু নয়, একটু দরকার ছিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে নিলাদ্রী বলল, আপনি একটু ধরুন আমি দেখছি শুভেন্দু কোথায়।

ফোন ধরে আছে কাবেরী। গলার ভিতরটা খুব শুকনো লাগছে। এক্ষুনি একটু জল খেতে পারলে ভালো ছিল। কিন্তু লাইনটা কাটতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কাবেরীর তৃষ্ণা বাড়াতেই যেন নিলাদ্রীর স্বর ফিরে এল। নিলাদ্রী বলল, ব্যাপারটা আমাকে বলা যায় না?

বেশ রাগত স্বরে কাবেরী বলল, কেন!

—না। শুভেন্দু একটু ব্যস্ত আছে তো।

—ব্যস্ত? কেন কি করছে!

—আমাদের ব্রাঞ্চ থেকে একটা ম্যাগাজিন বেরোয় না, সেটার মিটিং চলছে।

—পত্রিকার মিটিং!

মিটিং মানে তো তপতী ভট্টাচার্যের কবিতা ছাপা হবে কী হবে না তাই নিয়ে বাকবিতন্ডা। ভদ্রমহিলা ওদের ব্রাঞ্চে চাকরি করে। শুভেন্দুর মত তপতী যথেষ্ঠ ভালো কবিতা লেখে। কিছু লোক ঈর্ষায় সেটাকে খারাপ বলে। তাই শুভেন্দুর লড়াই। প্রথম যখন কথাটা জেনেছিল কাবেরী বেশ ভয় পেয়েছিল। মধ্যবয়সে এসে মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারে শুভেন্দুর কোনও মতিভ্রম ঘটছে না তো, পরে শুভেন্দুর ওপরে নজর রেখে বুঝেছে আসলে এটা শুভেন্দুর অফিসপ্রেম। মানে দশটায় শুরু হয় আর বিকেলে চারটে-সাড়ে চারটের সময়, তপতী ভট্টাচার্য যখন চলে যায় তখন প্রেম শেষ হয়। মানে চোখের প্রেম। দর্শন সুখ। মনে-মনে কাবেরী অ্যালাও করেছে। এই বয়সে শুভেন্দুর কাছ থেকে নতুন কী আর পাওয়ার আছে? শুধু ডানা না মেললেই হল। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই অ্যালাওটাকে আর বজায় রাখতে পারছে না কাবেরী। বেশ উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, ওকে বলুন বিশেষ দরকার। ওর সঙ্গেই কথা বলতে চাই....

ফের কিছুক্ষণের নীরবতা। আবার নিলাদ্রীর স্বর ফিরে আসে ফোনে, নিলাদ্রী বলল, আসলে কবিতা পাঠ চলছে তো, ওরা এখন কোনও কথা শুনবে না....

গা রি-রি করে উঠল কাবেরীর। মেয়ের বাবা এখন তপতী ভট্টাচার্যের কবিতা শুনছে, মানে বাবার প্রেম চলছে। মেয়ে বাবার

বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করছে, আর তার বাবা অফিস কলিগের সঙ্গে। বাঃ। চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে কাবেরীর। তার অজান্তে কখন তার সংসারটা হাতের বাইরে চলে গেছে সে জানে না!

নিলাদ্রী কী ভাবছে কে জানে। কিছু বলতেই হয়। এভাবে নীরব থাকার কোনও মানে নেই। কিন্তু কাবেরীকে নিলাদ্রীই বাঁচিয়ে দিল। বলল, আপনি রাখুন আমি শুভেন্দুকে বলছি ও আপনাকে ফোন করছে, ঠিক আছে?

অনেকক্ষণ পরে ভালো করে একটা নিশ্বাস নিল কাবেরী। দু-হাত দিয়ে কপাল চেপে মাথানিচু করে ফেলল। এলোচুল কিছুটা কপালের ওপর দিয়ে নেমে এসে ঢেকে দিল মুখ। কোথা দিয়ে কীসব ঘটে যাচ্ছে। অথচ কি ছন্দবদ্ধই না ছিল জীবনটা। রিমি কলেজ শেষ করে গুজরাটে গেল পোস্ট গ্র্যাজুয়েশান করতে। কাবেরীর মনে হয়েছিল একটা বড় কাজের অনেকটাই যেন শেষ করে ফেলল। ওখান থেকে খবর আসত পড়াশোনা ভালোই চলছে। নিশ্চিন্ত থাকার ওপরে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া জমেছে। সুখের মেদ বৃদ্ধি। শুভেন্দুর ব্যাঙ্কের বড় চাকরি। অর্থের আগমন এই সংসারে কোনওদিনই অপ্রতুল নয়। ফলে ওই সমস্যা নেই। মাঝখানে কাবেরীর এই কালীঘাটের একান্নবর্তী শ্বশুরবাড়ি ভেঙে মাল্টিস্টোরিজ উঠেছে। হাজার স্কোয়ার ফুটের মার্বেল লাগানো ফ্ল্যাট। হাতে কিছু টাকাও আসে ওই সূত্রে। তা দিয়ে নবসাজ হয়েছে ফ্ল্যাটের। আর এসব কিছু হওয়ার পরে শরিকদের পরস্পরের সঙ্গে দেখাও অনেক কমেছে।

সব মিলিয়ে যাকে বলে আস্ত চব্বিশটা ঘণ্টাই যেন কাবেরীর

জীবনে অবসর হয়ে দেখা দিল। তখনই গড়িয়াহাটের বেনুদি বাঁচিয়ে দিয়েছিল কাবেরীকে। কলেজে পড়ার সময় থেকে চিনত বেনুদিকে। তখন ব্লাউজ, শাড়িতে পিকো, ফলসের কাজ করানোর দোকান ছিল গড়িয়াহাটে। দোকানে যেত কাবেরী। ওনার স্বামী 'থান্ডার ফ্যান'-এ কাজ করতেন। হঠাৎ করে মারা গেলেন। দোকান বিক্রি করে দিলেন বেণুদি। তারপর রাস্তাঘাটে দেখা হয়েছে। বেণুদি ওয়ার্ড কাউন্সিলারের সঙ্গে কাজ করত। কিন্তু রাজনীতি তৃপ্তি দিতে না পারায় বেণুদি পরিচিত স্বল্প পরিচিতদের নিয়ে একটা আড্ডা গড়ে। সেখানে শুধু আড্ডা হয় না, নানান জনের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়, সমাধান বের করার চেষ্টা হয়।

বেণুদি বলেছিল, আসিস না আমাদের আড্ডায়, ভালোলাগবে। শুধু সমস্যা নিয়ে আমাদের কাজ নয়, গান-বাজনা হয়, অনুষ্ঠান হয। গিয়েছিল কাবেরী। তারপর আর যাওয়া নয়, নিজের যাবতীয় অবসর মুছে ফেলার জন্যে কখন যেন সেই লেডিজ ক্লাবের হোতা হয়ে গেছে। আচ্ছা, ক্লাব নিয়ে এতটা মেতে ওঠা কি ঠিক হয়নি? যার জন্যে কি তার সব অনুভূতি একমুখী হয়ে গেছে? না হলে পুণার চাকরি ছেড়ে দিয়ে রিমি তার সঙ্গেই আছে, অথচ একবারের জন্যেও মা হয়ে টের পেল না মেয়ে এরকম একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসে আছে? কী করবে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না কাবেরী।

কাবেরীর মোবাইল বেজে উঠল। কানে ধরতে শুনতে পেল শুভেন্দুর গলা, কী ব্যাপার নীলুকে ফোন করেছিলে?

—হ্যাঁ, যার স্বামী অফিসে বসে প্রেম করে তাকে তো প্রবলেমে পড়লে অন্য লোককেই ফোন করতে হয়।

শুভেন্দু দরাজ কণ্ঠে হাসে, কী যে বলো!

—কী যে বলো? ন্যাকামি হচ্ছে! কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করেছি তুমি জানো? কি, না পত্রিকা নিয়ে মিটিং হচ্ছে, আরে বাবা পত্রিকা মানে তো ওই তপতী ভট্টাচার্যের কবিতা শোনা। কী কবিতা যে তুমি শোনো আমি জানি, হ্যাংলার মতো ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকো শুধু....

—কী বলছ কি। শুভেন্দু হাসে। ও কত ভালো কবিতা লেখে জানো? এই ইস্যুর জন্যে বেশ ভালো একটা কবিতা দিয়েছে, অথচ ওরা ছাপবে না! আমিও ছাড়ার পাত্র নই। সেই নিয়েই মিটিং চলছিল।

রাগে নিজের ভিতরে নিজেই শুধু ফুটছে কাবেরী। কাকে কী বলবে। পঞ্চাশ পার করা তার স্বামী সহকর্মিণীর কবিতা কত ভালো সেই ভাবনায় নিমগ্ন, এদিকে নিজের মেয়ে যে গোল্লায় যাচ্ছে সে খবরই নেই। প্রায় ধমক দিয়ে কাবেরী বলে উঠল, কিন্তু তোমাব বন্ধু সুব্রত রায় যে তোমার মেয়ের মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে সেই খবরটা কী তুমি রাখো?

—সুব্রত! রিমির মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে! কেন!

—কেনটা আমি কী করে বলব, দেশে তো কতজনই ভালো কবিতা লেখে, তুমি শুধু তপতী ভট্টাচার্যের কবিতা ভালো এটা কেন বুঝলে সেটাই বা কে বলতে পারে!

—বাজে কথা রাখো। শুভেন্দুর কণ্ঠে এবার হাসি নেই। মৃদু বিরক্তি। বলল, সুব্রতর সম্পর্কে এরকম কথা কী করে বলছ! ওকে আমি কতদিন ধরে চিনি তুমি জানো।

—কিচ্ছু চেনো না, একটু আগে অনিন্দিতা ফোন করেছিল, ও কী একটা কাজে বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে গিয়েছিল, বাড়ি ফেরার সময় প্যান্টালুনসের সামনে সুব্রত আর রিমিকে দেখেছে।

—তাতে কী হল! রিমি কাজে বেরিয়েছিল, সুব্রতও হয়তো কোনও কাজে বেরিয়েছিল, দেখা হয়ে গেছে...

—দেখা হয়ে গেছে! দেখা হয়ে গেলেই একজন আরেকজনকে আইসক্রিম খাওয়ায়?

—রাস্তায় কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হয়ে গেলে একজন আরেকজনকে আইসক্রিম খাওয়াতে পারে না?

—তা বলে গায়ে গা লাগিয়ে হাসতে-হাসতে?

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। শুভেন্দু বলল, অনিন্দিতা ঠিক দেখেছে তো?

—দেখো মেয়ের কোনও খোঁজখবর তুমি রাখো না, আমি দিচ্ছি, তার ওপরে তুমি সন্দেহ করছ! তুমি কীরকম বাবা বলত!

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল শুভেন্দু। তারপর বলল, আমি সুব্রতকে চিনি ও কিন্তু ওরকম নয়।

—ওরকম নয়! তুমি এখনও কথাটাকে গুরুত্ব দিচ্ছ না! তারপরে যখন কিছুই করার থাকবে না তখন মাথা চাপড়াবে!

—মাথা চাপড়াব কেন!

—তা অবশ্য ঠিক, মাথা চাপড়াবে কেন, তখন তো তোমার হাতে তপতী ভট্টাচার্যের কবিতা শোনার জন্যে আরও সময় চলে আসবে, কিন্তু আমার কী হবে একবার ভেবে দেখেছ! আমি কী নিয়ে থাকব?

শুভেন্দু হাসল, তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছ।

—অহেতুক! আমার সোনার লক্ষ্মী মেয়েটাকে একটা হাবড়া লোক সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর আমি অহেতুক ভয় পাচ্ছি!

—কেউ কোত্থাও টেনে নিয়ে যাচ্ছে না কাবেরী। আমি ভালো করে সুব্রতকে চিনি, কম সময় তো আর কাটাইনি ওর সঙ্গে, ও কারুর সর্বনাশ করতে পারে না, ও সবসময় মানুষকে কিছু না-কিছু দিয়ে যায়।

—হ্যাঁ দিয়েই তো যায়, যেমন তোমার মেয়েকে প্রেম দিয়ে যাচ্ছে।

শুভেন্দু আগের থেকেও জোরে হেসে ওঠে। বলে, ও মেয়েকে না দিয়ে তোমাকে দেবে এই তো, ঠিক আছে আমি সুব্রতকে সেরকমই বলে দিচ্ছি।

এই মুহূর্তে শুভেন্দুর প্রতিটা কথা অসহ্য লাগছে কাবেরীর। তবু কথা বলতে হচ্ছে মেয়ের স্বার্থে। দাঁতের সঙ্গে দাঁত ঘষে বলল, তুমি সুব্রতকে ফোন করে সবকথা জিগ্যেস করবে, না আমায় ওর মোবাইল নম্বরটা দেবে?

শুভেন্দু ফের হাসে, যদি সত্যি কিছু থাকে ওকে ফোন করে সরাসরি জিগ্যেস করলে ও বলবে! এই তোমার বুদ্ধি!

এবার কথা, রাগ, ঝাঁজ—সব হারিয়ে ফেলল কাবেরী। কথাটা শুভেন্দু ভুল কিছু বলেনি। তাহলে?

মুখ ফসকে বলে ফেলল কাবেরী। এতক্ষণ যাকে দাবড়াচ্ছিল এখন তার কাছ থেকেই পরামর্শ চাইছে কী করা যায়।

শুভেন্দু তেমনই হেসে বলল, শোনো অধৈর্য হয়েও না, শান্ত

হয়ে বসো, আমি আসছি, তবে একটা ব্যাপারে...

শুভেন্দু কথা শেষ করতে পারল না। ফোনটা কেটে দিল কাবেরী। শুভেন্দুর কথাগুলো যে একটুও ভালো লাগছে না। বুঝতে পারছে না কোনও বিপদগ্রস্ত মেয়ের বাবার সঙ্গে কথা বলছে না একজন ফিলজফারের সঙ্গে কথা বলছে? ডাইনিং হলের দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকাতে কাবেরীর ভেতরে জমে ওঠা উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। প্রায় পৌনে সাতটা। দুপুরে বেরিয়েছে এগারোটা নাগাদ। কোনওদিন রিমি এতক্ষণ বাইরে থাকে না। তাহলে? আজ রিমি বাড়ি ফিরবে তো? একরাশ উত্তেজনা নিয়ে ব্যালকনিতে আবার বেরিয়ে এল কাবেরী।

॥ দুই ॥

আকাশের বুক থেকে এক অদ্ভুত সুন্দর ওড়না নেমে আসছে গঙ্গার ওপরে। বিকেলের আলো যত কমে এসেছে সেই ওড়না গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে রিমির চোখে। আর এখন, সূর্যাস্তের পরে, সব আলো মুছে গিয়ে চারপাশের প্রকৃতি শুধু ওড়নাটাকেই দৃশ্যমান করে রেখেছে রিমির চোখে। প্রকৃতিও যে মেয়েদের শালোয়ার-কামিজের ওড়নার মতো নিজের শরীরের ওপরে ওড়না মেলে ধরে এর আগে জানতে পারেনি। আজও জানতে পারত না যদি না তার পাশে সুব্রত রায় থাকত। যখন এই জায়গাটায় এসে বসে তখন চারপাশে বেশ আলো। দূরে দ্বিতীয় হুগলিসেতুর লোহার দড়িগুলো আকাশের বুকে একটা জ্যামিতি তৈরি করে রেখেছে।

তার অনেক নিচে স্বল্প তরঙ্গের জলরাশি। তার ওপর দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে লঞ্চের চলে যাওয়া। ওপারের রিভারলাইনে কোনও জাহাজ মেরামতির ইউনিট রয়েছে সম্ভবত। তারই দীর্ঘ ক্রেন এগিয়ে এসেছে জলের ওপরে। ক্রেনের পায়ের কাছে অজস্র লতাপাতা নিয়ম না মেনে বেড়ে উঠেছে। এপার থেকে মনে হচ্ছে জলের হালকা ঢেউয়ের ওপরে আরেকটা ঢেউ। সেটা সবুজের ঢেউ।

এখানে এসে বসার পরে এইসব কিছুই রিমি দেখতে পাচ্ছিল না।

দেখতে পাচ্ছিল সুব্রত। চারপাশ দেখছিল আর এইরকমভাবে বলছিল। ভ্রমণ চ্যানেলে প্রকৃতি দেখানোর সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভাষ্য চলে যেমন, ঠিক সেইরকম। সুব্রত যেন কোনও মানুষ নয়। কোনও প্রিয় টি. ভি চ্যানেল। জায়গাটাতে এসে ভালোলেগেছে রিমির। আরও ভালো লাগছে সুব্রতর বলা কথাগুলো শুনে। সুব্রত বলেছিল একটু অপেক্ষা করো দেখবে একটু পরেই আকাশের বুক থেকে একটা ওড়না নামবে এখানে। প্রথমে কথাটার কোনও মানে খুঁজে পায়নি রিমি। তারপরে ডিসেম্বরের বিকেলের হাওয়ায় যখন সিরসির করে উঠল রিমির শরীর, তখন কিছুই খুঁজে না পেয়ে কাঁধের ওপর থেকে এক স্ট্র্যাপের স্যাচেলটাই নামিয়ে নিয়ে বুকের ওপরে চেপে ধরে জড়সড় হয়ে বসতেই নজরে এল দৃশ্যটা। গঙ্গার ওপরে শূন্যে একটা বিরাট ওড়না ভেসে রয়েছে। পৌষের মাঝামাঝি এই ফাঁকা জায়গায় কুয়াশার স্তর নেমেছে। হয়ত শহরের মাঝখানেও নামে। ভিড়ে, মানুষের মাথার ধাক্কায় তা বোধহয় ভেঙে যায়। কিন্তু এখানে দেখা যায় এই খবরটাও আছে সুব্রতর কাছে।

অবাক হওয়ার মধ্যেই একটু-একটু করে মুগ্ধতার দিকে এগিয়ে গেছে রিমি। কিন্তু সুব্রতর প্রতি মুগ্ধতাটা থেমে থাকেনি। ঝুপঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসায় কুয়াশার স্তরটা যেন বেশি স্পষ্ট হয়েছে। ওটার ওপরে চোখ আটকে থাকার কারণ সুব্রতর কথা। ওটা তো কুয়াশা নয়, সুব্রত যা বলেছে ঠিক তাই, ওড়নাই তো। প্রথম শীতের বাতাস সেই কুয়াশা-স্তরে হালকা করে ধাক্কা দেওয়ায় একটু গোল হয়ে গেছে এক জায়গায়। ঠিক যেভাবে ওড়না মেয়েদের বুকের কাছে গোল হয়ে ঝোলে।

যে সিমেন্টের বেঞ্চে রিমি আর সুব্রত বসে আছে ঠিক তার পাশেই দণ্ডায়মান ফ্লুরেসেন্টের আলোটা জ্বলে উঠল। সামনের দৃশ্যাবলী প্রায় সবটাই হারিয়ে গেছে। শুধু হাওড়ার কিছু আলো বোঝাচ্ছে ওপারে কোথায় গঙ্গার শেষ হয়েছে। কিন্তু ফ্লুরেসেন্টের আলোর জন্যে সুব্রত রিমির চোখে স্পষ্ট। রিমি সুব্রতর চোখে চোখ রেখে বলল, এই যে কথাগুলো আপনি বললেন সেগুলো আপনি লেখেন না কেন!

দু-তিনদিনের না কামানো আধ পাকা আধ কাঁচা দাড়ি লম্বাটে আঙুল দিয়ে মৃদু চুলকে নিয়ে সুব্রত বলল, আমার তো ডায়রি লেখার অভ্যাস নেই।

—আমি তো ডাইরি লেখার কথা বলিনি।

—তাহলে?

—এগুলো নিয়ে তো কবিতা লিখতে পারেন। গল্পও লিখতে পারেন। বা গল্প-কবিতা ঠিক নয়, এমনিই লিখলেন।

সুব্রত হাসল। ও শব্দ করে হাসে না। হাসলে ওর দাঁত দেখা

যায় না। শুধু ঠোঁট ছড়িয়ে হাসে। তবু হাসিটা নির্মল। দরাজ। বলল, ওসব কী সকলের কম্ম, তোমার বাবা পারে, আমি পারি নাকি।

—পারা না-পারা বলছি না। আপনি ঠিক যেভাবে আমাকে বলছেন সেভাবেই লিখে রাখুন না।

ঠেলে নিয়ে যাওয়া আইসক্রিমের গাড়ি যাচ্ছিল ওদের পেছন দিয়ে। সুব্রত ওদিকে তাকিয়ে বলল, আইসক্রিম খাবে?

ব্যাপারটা যেন দারুণ প্রশংসা করেছ, এবার একটা আইসক্রিম খাও।

—ধ্যাৎ আপনার সঙ্গে কথা বলা যায় না। সুব্রতর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল রিমি।

সুব্রত আইসক্রিমওয়ালাকে বলল, দুটো বাটারস্কচ।

রিমি ফের মুখ না-ঘুরিয়ে পারল না। আজ কী আইসক্রিমে পেয়েছে সুব্রতকে। দুপুরে প্যান্টালুনসের সামনে যখন হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল তখন একটা করে বাটারস্কচ হয়ে গেছে।

আগের তিনদিনের মতো আজকের দেখাটাও হঠাৎ করে হল। একবার রিমির মন বলে উঠেছিল এটা কী করে হয়। দেখা হওয়ার কোনও কথা নেই অথচ দেখা হয়ে যাচ্ছে। একদিন নয় দু-দিন নয় তিনদিন নয়, আজ নিয়ে চারদিন! এর কী মানে? মানে খোঁজার বিশেষ সুযোগ অবশ্য রিমি পায়নি। রিমি কোথায় যাচ্ছে, সুব্রত কোথায় যাচ্ছে, স্বাভাবিক প্রশ্ন বিনিময়ের পরেই ফুটপাতের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা আইসক্রিমের গাড়ির দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলেছিল, আজ একটা ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব না?

রিমি সরলভাবেই ঘাড় নেড়েছিল, হ্যাঁ।

ওমনি সুব্রত বলে উঠল, ঠান্ডা পড়লে না আমার আইসক্রিম খেতে খুব ভালোলাগে। রিমির বুকের ভিতরে একটা বল লাফিয়ে উঠেছিল। ঠিক তার মনের কথাটা বলল কী করে! তারও তো শীতকাল এলে খুব আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করে।

সুব্রত আইসক্রিমের গাড়ির সামনে এগিয়ে যাওয়ায় রিমিকেও সরে আসতে হল। আইসক্রিমওয়ালা কাপ এগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে খুবই দক্ষ। সুব্রতর ঠোঁট খুলে বাটারস্কচ শব্দ দুটো বেরতে যে সময় লেগেছিল আইসক্রিমওলার কাপ এগিয়ে দিতে সেই সময় লাগল না।

রিমি বাধ্য হয়েই আইসক্রিমের কাপটা ধরে ফেলেছিল। কাপের ওপরের পাতাটা সরিয়ে প্লাস্টিকের চামচ ঢুকিয়ে আইসক্রিম তুলতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। আর মুখের ভিতরে দেওয়ার পরে তো দাঁতগুলো সব কনকন করে উঠছিল। এই কনকন করে ওঠাটা খুব রেলিশ করে রিমি। গরমকালে আইসক্রিম খেলে এই অনুভূতিটা পাওয়া যায় না। তাই শীতে আইসক্রিম খাওয়ার একটা অন্য থ্রিল আছে। আজ আবার এই থ্রিলটা একটু গাঢ় হয়েছিল। তার ভালোলাগার সঙ্গে তার বাবার বন্ধু, তার থেকে বয়সে কত বড় একটা মানুষের ভালোলাগা মিলে গেল। কই মানুষটাকে দেখে তো মনে হয় না এরকম রোম্যান্টিক! বাবার থেকে বয়সে ছোট অথচ দু-গালের ওপর থেকে ঔজ্জ্বল্য মরে গিয়ে বাবার থেকেও বয়সি দেখতে করে তুলেছে। একটা দাঁত নড়ছে কিন্তু তারজন্যে আইসক্রিম খাওয়াতে কোনও খামতি নেই। রিমি মনে-মনে বলে উঠেছিল হি নোজ হাউ ট্যু এনজয় দ্যা লাইফ। আইসক্রিম খেতে-খেতে রিমি

জিগ্যেস করেছিল, কুকুর ছানাটা কেমন আছে?

সুব্রতর আইসক্রিম খাওয়া থেমে গিয়েছিল। অবাক হয়ে জিগ্যেস করে, কোন কুকুর ছানা?

—সেই যে সেদিন হাতিবাগানে যেটাকে রাখতে গেলেন।

—বাবা তুমি মনে রেখেছ!

—ও মা মনে না রাখার কি আছে!

—তা না, আসলে আজকাল মানুষ এসব তুচ্ছ ব্যাপার মনে রাখে না, তাছাড়া এসব তো আসলে পাগলামি, বলো?

—পাগলামি হবে কেন! কুকুরছানাটার কি প্রাণ নেই! ওর বাড়ির লোকেরা বেড়াতে যাবে, সঙ্গে নিতে পারবে না, তা ওকে কে দেখবে? আপনি দায়িত্বটা নিলেন বলেই না ও বাঁচল...

আইসক্রিম খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল সুব্রতর। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে বলেছিল যতই কুকুরছানাটার ব্যাপারে তুমি ফিল করো আর আমার প্রশংসা করো, ভুলেও কিন্তু এসব কথা তোমার মাকে বোলো না।

রিমিরও আইসক্রিম খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। গাড়ির পাশেই রাখা বাস্কেটের মধ্যে শূন্য কাপটা ফেলে দিয়ে রুমালে হাত মুছতে-মুছতে বলল, কেন!

—আরে বাবা এসব কথা তোমার মাকে বললে আর আমি তোমাদের বাড়িতে কবিতাপাঠের আসরে যেতে পারব!

আরও অবাক হয়ে আরও প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়েছিল রিমি।

সুব্রত হেসে বলেছিল, তুমি হয়তো জানো না যে তোমার মা মনে করে তোমার বাবার এই কবিতা লেখা, পত্রিকা করা,

কবিতাপাঠের আসর করা—এগুলো করে মাথার অর্ধেকটা খারাপ হয়ে গেছে, আর এরজন্যে আমিই দায়ী, তারপরে যদি শোনে বাবার পরে মেয়ের মাথাটাও আমি খারাপ করে দিচ্ছি তাহলে নির্ঘাত জেলে ঢুকিয়ে দেবে...

রিমি হাসতে-হাসতে বলেছিল, আমি তো মা'কে সব বলেছি, কুকুরের ক্রেশের কথা, বাগনানের সেই কালো গোলাপ বিক্রেতার কথা, সব বলেছি।

—জানতে চাইল না কার সঙ্গে গিয়েছিলে?

—না।

—তাই বেঁচে আছি এখনও। তা শুনে কী বলল?

—কিছুই না। তবে চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম বক্তব্য হচ্ছে ইউ আর ওয়েস্টিং ইত্তর ভ্যালুএবেল টাইমস্ এ্যান্ড নাথিং এলস্।

আইসক্রিময়লাকে পেছনে রেখে ওরা দুজনেই তখন গড়িয়াহাটের মোড়ের দিকে চলে এসেছে। সুব্রত দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিল, এটা কিন্তু তোমার মা ভুল কিছু ভাবছে না।

রিমি কোনও উত্তর না দিয়ে বেশ ইঙ্গিত পূর্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল সুব্রতর দিকে। মানে, ঠিক বুঝলাম না তো কী বলতে চাইছেন, একটু খোলশা করে বলুন তো।

রিমির নীরবতায় কী বুঝল সুব্রত কে জানে। সুব্রত বলল, তোমার মতো মেয়েকে অবশ্য এসব কুকুরছানার ক্রেশ, কালো গোলাপের বিক্রেতা—এইসব ব্যাপার নিয়ে ইনটেরেস্টেড হওয়াটা মানায় না।

—আমার মতো মেয়ে মানে...

সুব্রত বেশ গদগদ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলেছিল, স্কুলিং ফ্রম ক্যালকাটা গার্লস, ইংলিশ অনার্স ফ্রম প্রেসিডেন্সি, ফ্যাশান ডিজাইনিং-এ পি. জি ফ্রম গুজরাট, বাইশ হাজার টাকার মাইনের চাকরি, তাও আবার ছেড়ে দিলে...ইচ্ছে করলে ওর থেকে বেশি মাইনের একটা চাকরি তো তুমি জোগাড় করে নিতে পারো। আচ্ছা বসে আছ কেন বলত!

রিমি স্বল্প বিস্ময়, স্বল্প রাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, অবাক হয়ে বলল, বসে আছি কোথায়! দিব্যি তো আপনার সঙ্গে হাঁটছি।

সুব্রত হাসল। কিন্তু সেই হাসিটাকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে রিমি বলে উঠেছিল, আমি নতুন কোনও চাকরি খুঁজছি না বলে আপনার খুব অসুবিধা হচ্ছে না?

—ও মা! সে কি কথা, আমার অসুবিধা হবে কেন! আমি বলতে চাইছিলাম তোমার মতো কৃতী মেয়েরা জীবনে উন্নতি করলে অনেক মানুষেরই উপকার হয়। তোমাদের উন্নতি মানে তো কর্মযজ্ঞ, আর যজ্ঞ তো কখনও একা-একা করা যায় না...

রিমি গম্ভীর হয়ে বলেছিল এই একা-একা করা যায় না বলেই আমি কোনও কর্মযজ্ঞে থাকতে চাই না, আমার উন্নতির দরকার নেই...।

সুব্রত এবারে বোবা। রিমির বলা কথাগুলো পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। কোথায় যেন একটা বুঝতে না পারা রয়ে যাচ্ছে।

রিমি বলল, আমি যে ব্যস্ত জীবন কাটিয়েছি, আপনি সেটা ইমাজিন করতে পারবেন না। আপনি ভাববেন না আপনাকে আমি

আন্ডার এস্টিমেট করছি...

সুব্রত সরল হেসে বলেছিল, আরে না-না, তা কেন, তুমি যা বলছ সেটা তো তোমার বাস্তব।

সুব্রতর কথাগুলো খুব ভালোলেগেছিল রিমির। তার এই সমস্যার কথা বলার পরে অনেক সময়েই রিমি লক্ষ্য করেছে যাকে বলল সে হয়তো ভাবল, এটা রিমি অহঙ্কার প্রকাশ করল। কিন্তু রিমি বুঝেছিল বাবার বন্ধু সুব্রত সেরকম লোক নয়। বয়স্ক, সম্পর্ক দূরের, তবুও অনেকদিন পরে কোনও মানুষের সঙ্গে একটা সঠিক কমিউনিকেশান হল যেন। কথা বলায় খুব উৎসাহ খুঁজে পেয়েছিল রিমি।

গলগল করে রিমি বলছিল, আটটার মধ্যে স্নান .ব্রেকফাস্ট সেরে অফিসের গাড়িতে উঠে পড়া। ঢুকেই হাই হ্যালো। যাবতীয় উইশ মনে করে ঠিকঠাক ভাবে সারা। তারপর বসে পড়ো কম্পিউটারের সামনে। মাউস ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ঢুকে পড়া কালকের অর্ধসমাপ্ত পোশাক ডিজাইনিঙের মধ্যে। কাল একটা ছবি আঁকতে-আঁকতে উঠে গিয়েছিল আজ ঠিক সেখান থেকেই শুরু করা। এটা রোজ-রোজ সম্ভব! ক্রিয়েশানের কোনও রুটিন থাকে?

সুব্রত হেসে বলেছিল, রুটিন না থাকলে যে বাইশ হাজার টাকাও থাকবে না।

—দরকার নেই থাকার। আমি আমার ইচ্ছে মতো মাঝেমধ্যে ডিজাইন করে পুরোনো কম্পানিতে যেমন পাঠাই তেমন অন্যান্য জায়গায়ও পাঠাই, তাতে যা পাই যথেষ্ঠ। আমাদের কালীঘাটে অত বড় ফ্ল্যাট, বাবা ব্যাঙ্কের অফিসার, এখনও দশ বছর চাকরি আছে,

আমার অত ছোটার কী দরকার!

সুব্রতর বুকের মাঝখানটায় মেঘ গুরগুর করে উঠল। অনেকদিন পরে কারুর কথা শুনে খুব ভালো লাগছে। একজনের মনের ভিতরটা দেখে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছে নিজের ভেতরটা। এই শহরে এরকম একটা মনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে কোনওদিন সে কী স্বপ্নেও ভেবেছিল! তার তো কত ঘোরাফেরা। কত ঘোরাফেরা আবার কী! ঘোরাফেরাই তো তার কাজ। তার বেঁচে থাকা। শুভেন্দুকে যেমন পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে সাহায্য করে, গোলপার্কের দিবাকরকে তেমন মডেলিঙের ব্যাপারে সাহায্য করে। বসুশ্রী সিনেমার পাশে মহিম হালদার স্ট্রিটে থাকে বিক্রম। বিক্রমদা। সুব্রতর দূর সম্পর্কের দাদা। তাকে সুব্রত সাহায্য করে একজন পাগলকে ওষুধ খাওয়ানোর সময়। পাগলটি সুব্রতর একরকমের পিসেমশাই। এ ছাড়া কবিতাপাঠের আসর, এলাকায় রক্তদান শিবির, বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন—এসব তো রয়েছে। কিন্তু যেখানেই গেছে একটা কথা বুঝেছে—ছোটার কী দরকার এটা কেউ-কেউ ভাবে না। ভাবনাটা আসলে—ছোটাই দরকার।

শুভেন্দুর বাড়ির কবিতার আড্ডায় আসে একটি ছেলে প্রদীপ্ত সিংহ। রাজ্য সরকারের চাকুরে। বাস ভাড়া বা ভিখারিকে পয়সা দিলেও হিসেবের মধ্যে রাখবে। এদিকে কবিতা লেখে। মাঝেমধ্যেই বলে এই তিনমাসে উনচল্লিশটা কবিতা বেরোল। এই দু-মাসে সাতাশটা লিখলাম। সুব্রত ভেবে পায় না এতে কী হবে, চাকরিতে ওর প্রমোশন হবে না, ওর বউ আরেকটু বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে না, ওর ছেলে পড়াশোনায় আরও ভালো হয়ে যাবে না, এমনকী

কবি হিসেবে পরিচিতদের কাছে যে-জায়গায় ছিল সেই জায়গাতেই থাকবে। তাহলে এত সংখ্যা বাড়িয়ে কী হবে! জানে না। তবু ছোটা চাই। অতি তুচ্ছ কারণে যখন এত ছোটাছুটি, সেখানে যার অমন কেরিয়ার, সে বলছে অত ছোটার কী দরকার! সুব্রতর মন বলেছিল, শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া গেল যাকে খুঁজছিলাম।

সুব্রত বোধহয় বেশ গভীর করেই তাকিয়ে ছিল রিমির দিকে। লজ্জা পেয়ে রিমি হাসল। বলল, দু-তিনদিন দাড়ি না কামালে না আপনাকে লাকি আলির মতো দেখায়...

—লাকি আলি। সিঙ্গার, অ্যাকটর—দ্যাট সেলিব্রেটি, ওরে বাবা!

—আরে বাবা আমি কি ওনার গান, অভিনয়ের কথা বলেছি! বলছি দাড়ি না কামালে আপনাকে ওনার মতো দেখায়।

সুব্রত বলেছিল, তোমার লাকি আলিকে ভালোলাগে?

—দারুণ। চোখ দুটোর মধ্যে কীরকম প্যাথোজ। হাসিটা সুইট।

সুব্রত গুনগুন করে গেয়ে উঠল, এক পল কা জিনা, ফির তো হ্যায় যানা...।

—আপনি দেখেছেন 'কহনা পেয়ার হ্যায়'?

—দুবার।

—বাবা!

—ভাবতেই পারছ না-না? আসলে তোমাদের বাড়িতে কবিতার আড্ডায় দেখছ তো, আর সব মুখগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে ফেলছ। তবে কী জানো ওদের মধ্যেও অনেকে দেখেছে কিন্তু আমার

মতো বলে দেবে না।

রিমি কি বলবে কিচ্ছু বুঝতে পারছিল না। বোঝাই যাবে না এনার মধ্যে এরকম একজন ইনটেরেস্টিং মানুষ লুকিয়ে আছে। মুখের ওপরে একটা খসখসে ভাব আটকে দিয়ে বেশ বয়সি করে তুলেছে। চুলে সম্ভবত কলপ করে। দু-একটাতে রং উঠে গিয়ে কপালের কিনারায় রুপলি রেখা। গালে দু-চারদিনের দাড়ি। শুকনো কাঠের অনুভূতি দেয়। জীবনের রূপ-রস গন্ধ যেন নেই। অথচ ভিতরে কত অনুভব, প্রাণকণা। ভালোলাগা কী এইরকমই চমকে দিয়ে দেখা দেয়!

রিমিকে চুপ করে থাকতে দেখে সুব্রত বলেছিল, এসব কথা আবার তোমার বাবা-মা'কে বলো না যেন।

—কেন বললে কী হবে!

—হবে আবার কী, ওখানে এসব কেউ নিতে পারবে না। কথার মাঝখানে নিজে-নিজেই থেমে গিয়েছিল সুব্রত। তারপর বলেছিল, আমি শুধু তোমার বাবা-মা'কেই মিন করছি না আমাদের ওই আড্ডা যেটা তোমাদের বাড়িতে বসে সেখানে কেউই নিতে পাববে না আমার ফিলিংস্।

রিমির ভিতরে কিছু বলার জন্যে একটা তোড় উঠে এসেছিল। কিন্তু সেটা থেমে গেল। রিমি ভেবেছিল সুব্রত একটা ভয় পাচ্ছে তাই বলতে বারণ করছে। পরে বুঝল ঠিক তা নয়। অনুভবের সঙ্গে অনুভব না মেলার ব্যথা মানুষটা জানে। তাই আগে থেকে সাবধান হয়ে যাচ্ছে। এটা তো তারও কথা। অনুভবের সঙ্গে অনুভব না মিললে সেখান থেকে চলে এসো।

কিন্তু কত জায়গা থেকে চলে আসবে? পুণায় ভালো লাগেনি। চলে এসেছে। কিন্তু বাড়িতেও তো ভালোলাগছে না। মার সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্পর্কটা যেন কোথায় কেটে যাচ্ছে। কেটে যাচ্ছে বুঝতে পারছে কিন্তু ঠিক কোথায় কেটে যাচ্ছে বুঝতে পারে না রিমি। পুণা থেকে আসার পরে মার সঙ্গে একদিনও ঝগড়া হয়নি। মা তাকে বকেওনি। কিন্তু সকাল-সকাল বিছানা ছেড়ে ক্লাসিক্যাল সাধা, তারপর বাজারে যাওয়া, দুপুরে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এরকম কাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়া—রিমির এই কাজগুলো যখনই নজরে এসেছে কাবেরী বলেছে, এসব কাজ করার জন্যে তোমায় এত ভালোভাবে বড় করিনি। কথাটা কখনও কাবেরী মুখে বলেছে, কখনও চোখে।

একবার দুবার রিমি রেগে যায়নি তা নয়। রেগে গিয়ে রিমি বলেছে তাহলে কী করব? পুণায় ফিরে যাব? কাবেরী রেগে গিয়ে বলেছে তোমার বাবা পার মানথ যা ড্র করে তাতে তুমি চাকরি না করলে আমাদের কিছু যায় আসে না। তাহলে? রিমির, প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে কাবেরী বলেছিল, তাহলে কী, তুমি বোঝার চেষ্টা করো। আমি বলতে চাইছি যাই করো নিজেকে একটা লেবেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। আগামী জীবনটার কথা এখন থেকে না ভাবলে পরে হাত কামড়াবে।

আগামী জীবন? ফের বিরক্তির সঙ্গে একটা প্রশ্ন ভেসে উঠেছিল রিমির ভিতরে। মা কি তার আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভাবছে? মা কি বোঝে না তার বেঁচে থাকা কখনই আটকে থাকবে না। তাহলে কী বিয়ের ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছে? নিজেকে দামি

বানিয়ে দামি বর জোগাড় করা। সেই মেয়েগুলোর মতো, যারা অভিনয় করতে এসে একটু নাম করলেই বিয়ে করে অভিনয় জগৎ থেকে চলে যায়? কিছুই বলতে পারেনি মাকে। মার ওপরে রাগ হয়েছে। মার জন্যে কষ্ট হয়েছে। রিমি বুঝেছে মা কী যেন ইনভেস্ট করেছে তার মধ্যে, সেটার রিটার্ন পাচ্ছে না। মানে এখন তারা আর মা মেয়ে নয়। বিনিয়োগ আর উৎপাদন।

রিমির মন ক'দিন ধরেই বলছিল পুণায় না ফিরলেও কলকাতায় থাকা তার চলবে না। এইরকম বিস্বাদ মন নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে আজ দুপুরে প্যান্টালুনসের সামনে রিমির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সুব্রতর। শীতকাল এলে তারই মতো সুব্রতরও আইসক্রিম খেতে ভালোলাগে কথাটায় যেন একটা বড়শি ছিল। বড়শিতে যেমন মাছ আটকে যায়, কথাটায় আটকে গিয়েছিল রিমি। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে কত কথা হয়ে গেল। এত কথা, এইসব কথা, এই শহরে কাউকে বলা যায় এটা তো রিমির কল্পনারও অতীত ছিল।

রাসবিহারীর মোড়ে পৌঁছে সুব্রত বলেছিল এখন কোনও কাজ আছে? রিমি মাথা নেড়ে খুব উৎসাহ নিয়ে বলেছিল, না।

সুব্রত বলেছিল, বাব্বা, অনেকদিন পরে কাজ না থাকা লোকের সঙ্গে দেখা হল। জানত এই শহরের পাগলরাও খুব ব্যস্ত, ঘড়ি ধরে পাগলামো করে, সে একদিন তোমায় দেখাব। কথা শেষ করে রিমির উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে ফেলেছিল সুব্রত। আর দরজা খুলে খুব সাবলীল ভঙ্গিতে রিমিকে

হাত ধরে টেনে ঢুকিয়ে নিয়েছিল ভিতরে। সজল তো সুব্রতর হাফ বয়সি। সজলও তো তাকে কতবার ট্যাক্সিতে তুলেছে। কিন্তু কোনওদিনও তো এমন সাবলীলভাবে টানতে পারেনি তার হাত। আরও একটু ভালোলেগে গিয়েছিল সুব্রতকে। বাবার বয়সি হতে পারে কিন্তু একটুও বাবামার্কা নয়। মানে নিজের বাবার সঙ্গে তুলনা করেনি। বাবার বয়সি লোকেরা যা হয় সুব্রত সেরকম নয়।

গাড়ি ছুটেছে এস. পি. মুখার্জি রোড ধরে। মনও ছুটেছে রিমির। চৌরঙ্গী পেরিয়ে গঙ্গার ধারে চলে এসেছিল। এই ধোঁয়া-ধুলোর শহরে এরকম একটা সুন্দর প্রকৃতিও আছে সুব্রতর সঙ্গে না মিশলে তো তার জানা হতো না। কথাগুলো একটার পরে আরেকটা ভাবনায় আসছে আর সুব্রতর ভিতরে এক ড্রপ-এক ড্রপ করে চুঁইয়ে পড়া স্যালাইন ওয়াটারের মতো মিশে যাচ্ছে রিমি। জায়গাটার বর্ণনা যা দিচ্ছিল তাতে আরও মুগ্ধ হয়ে যায়। তাই বলেছিল যে সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছে সেগুলো গল্প বা কবিতা করে তো লিখতে পারে। তার উত্তরে কোনও কথা না বলে আইসক্রিম কিনে খেতে থাকল সুব্রত!

সেই আইসক্রিম এখনও খাচ্ছে সুব্রত। মনে হচ্ছে আইসক্রিম খাওয়া শেষ না হলে কথার উত্তর দেবে না। রিমি রাগ করে খাচ্ছে না। একটা ভালো কথা বলল আর একজন সেকথার উত্তর না দিয়ে আইসক্রিম খেয়ে চলেছে! রিমির দিকে অবাক চোখে তাকাল সুব্রত। বলল, কী হল খাচ্ছ না কেন!

—দুপুরেই তো একটা খেলাম, এখন আর খাওয়াটা ঠিক হবে না, তার ওপরে ঠান্ডাও লাগছে।

সুব্রত হেসে বলল আজ পর্যন্ত যত লোক আমার সঙ্গে আইসক্রিম খেয়েছে তাদের কারুর গলা ব্যথা হয়নি।

সুব্রতর কথাগুলো শুনে আবার কথা বলার উৎসাহ পেল রিমি। বলল, আমি যেটা জিগ্যেস করলাম তার উত্তর তো দিলেন না...

—কী!

—ওই যে এত সুন্দর বর্ণনা দেন সেগুলো নিয়ে লেখেন না কেন!

—আমার যে বর্ণনা দিয়েই সুখ হয়ে যায়, তৃপ্তি হয়ে যায়। সুব্রতর আইসক্রিম খাওয়া শেষ। ফাঁকা কাপটা ফেলে দিয়ে বলল, তুমি খাবে না?

রিমি চুপ করে থাকায় ওর হাত থেকে কাপটা নিয়ে খেতে থাকল। সুব্রত বলল, আমার কথাটা ঠিক বুঝলে না, না? অনেকেই বুঝতে পারে না। ব্যাপারটা কী জানো কোনও সুন্দর দৃশ্য কেউ দেখল. তার হয়তো সেটার ছবি আঁকতে ইচ্ছে হল, কারুর হয়তো তা নিয়ে একটা গান লিখতে বা কবিতা লিখতে ইচ্ছে হল, আমার কী হয় বলত, শুধু দেখতেই ইচ্ছে করে, সেটা নিয়ে ভাবতে ভালোলাগে, সেটার বর্ণনা দিতে ইচ্ছে করে, বর্ণনাটা কেউ শুনলে আমার ইচ্ছেটা পূর্ণ হয়ে যায়। আর কিছু করতে ইচ্ছে করে না...

রিমির অর্ধসমাপ্ত কাপটাও শেষ করে ফেলেছে সুব্রত। মুখ মুছে বলল, কিছু বুঝলে?

রিমি কোনও উত্তর দিল না। একথা বুঝবে কি! এরকম কথা তো এই প্রথম শুনল। তবে বুঝতে পারুক বা নাই পারুক

কথাগুলো মনের মধ্যে এক বিচিত্র ছোঁয়া দিয়ে গেল। যত শুনছে সুব্রতর কথা ততই মুগ্ধ হচ্ছে।

রিমির মুগ্ধতা মুছে দিল রিমির হাতে ধরে রাখা মোবাইল। মেসেজ সিগন্যাল বাজল দুবার। মোবাইল সেটে রিড টিপতেই স্ক্রিনের ওপরে ভেসে উঠল, বাইরে কী করছিস এতক্ষণ? ওল্ড হ্যাগার্ডটা তোর মাথা চিবিয়ে-চিবিয়ে খাচ্ছে আর তুই মাথা এগিয়ে দিচ্ছিস। বাড়ি আয় তাড়াতাড়ি। মেসেজটা মা পাঠিয়েছে। ভিতরটা কেঁপে গেল রিমির। মা কী করে জানল! এই নিয়ে তো মাত্র চারদিন মিট করেছে সুব্রতকে। সময় কাটানো বলতে আজই প্রথম। এখনও বাড়ি ফেরেনি। এর মধ্যেই মা খবরটা পেয়ে গেছে! লেডিজ-ক্লাব না করে মার তো উচিত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার হয়ে যাওয়া।

রিমির মুখ-চোখ দেখে সুব্রত বুঝতে পেরেছে কিছু একটা ঘটেছে, বলল, কী হল!

রিমি মোবাইলটা এগিয়ে দিল। মেসেজটা পড়ল সুব্রত। রাগল না একটুও। হেসে বলল, অনেকেই বলে আমি নাকি সুযোগ পেলেই কারুর মাথা চিবিয়ে খাই, কিন্তু কোনওদিনই কাউকে বোঝাতে পারিনি আমি কারুর মাথা চিবিয়ে খাইনি, যে যেটা চেয়েছে তাকে শুধু সেটা দিয়েছি, বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা নেই আমার, আমার যে শুধু...

কথা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল না সুব্রত। ঢোক গিলল। গভীর করে নিশ্বাস নিল। খসখসে গাল, দু-চারদিনের না-কামানো দাড়ি, কলপে কালো হয়ে থাকা, লাল হয়ে থাকা চুল—এই সবকিছুকে সরিয়ে যদি সুব্রতর চোখ দুটো শুধু দেখা যায়, তবে

এই মুহূর্তে ওর ব্যথায় ভরা চোখ দুটোর দিকে তাকালে মনে হবে শিশুর চোখ। তাই মনে হল রিমির। বাবার কাছাকাছি বয়সের কোনও লোকের চোখ কী শিশুর চোখ হতে পারে! কিন্তু এই মুহূর্তে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে তো তাই দেখতে পাচ্ছে। এরকম একটা মানুষকে কার না ভালো লাগবে। সিমেন্টের বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রিমি। দাঁতের ওপরে দাঁত চেপে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না, বাড়ি ফিরে মাকে কী বলতে হবে সেটা আমি জানি।

সুব্রত বলল, ছিঃ রিমি, ওভাবে বলতে নেই। কাবেরী তোমার মা আবার আমারও পরিচিত, তা ছাড়া উত্তব দিয়ে কোনও কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

রিমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সুব্রতর দিকে। মেসেজের মধ্যে ওল্ড হ্যাগার্ড শব্দ দুটো ব্যবহার করেছে মা। হ্যাগার্ড মানে নিশ্চয়ই জানে সুব্রত। তার পরেও কোনও উত্তেজনা নেই! কথাটা তাকে বলা হয়নি তাও ভিতরটা রি-রি করছে। অথচ কি স্বাভাবিক শান্ত স্বরে কথা বলছে সুব্রত। এমন স্নিগ্ধ স্নায়ুর মানুষের নামই কি প্রেমিক!

আজ নিয়ে চারটে দিনের মুখোমুখি হওয়া, একটুর থেকে আরও একটু বেশি সময় কাটানোর মধ্যে দিয়ে সুব্রত সম্পর্কে যে অনুভব রিমির ভিতরে উঠে আসছে তা তো ওদের ক্ষেত্রে হয়নি। ওদের সঙ্গে তো সুব্রতর থেকে অনেক বেশি সময় কাটিয়েছে সে। ওরা দুজনেই সুব্রতর থেকে কম বয়সি, সুব্রতর থেকে অনেক বেশি সুন্দর দেখতে। তবুও রিমির ভিতরে ওরা দুজনে সুব্রতর থেকে পিছিয়ে পড়েছে কেন! মা কি জানে, মাকে কি কোনদিনও রিমি

বোঝাতে পারবে ওল্ড হ্যাগার্ড হলেও এই মানুষটাই তার মনের দখল নিয়ে নিয়েছে।

নীরব রিমির মুখের দিকে তাকিয়ে সুব্রত কী বুঝেছে কে জানে। সুব্রত বলল, যদি সত্যি আমার কম্পানি তোমার ভালোলাগে তাহলে আমাকে নিয়ে মা'র সঙ্গে ঝগড়া কোরো না।

—লুকিয়ে রাখব! আমার ভালোলাগাটা আমি বলতে পারব না! এটা অন্যায়!

রিমি বেশ উচ্চকণ্ঠে কথা বলে উঠেছে। সুব্রত আর রিমির মতো আর যারা আশেপাশের সিমেন্টের বেঞ্চে বসে আছে গঙ্গার দিকে মুখ করে তাদের মধ্যে থেকে দু-তিনজন ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখছে রিমিকে।

সুব্রত গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, ব্যাপারটা ন্যায়-অন্যায়ের নয়, কোনও জিনিসকে প্রতিষ্ঠা দিতে গেলে কখনও-কখনও গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়। এটা অনেকটা ফেনসিঙের মতো। একটা চারাগাছ যখন বড় হয় দেখো না সেটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়।

শক্তিশালী পেনকিলার খেলে ব্যথা যেমন তাড়াতাড়ি কমে আসে তেমনই সুব্রতর কথাগুলো রিমির ভিতরের রাগটাকে দ্রুত নিভিয়ে দিল।

গঙ্গার তীরবর্তী উদ্যানজমি পেরিয়ে ওরা আসছে স্ট্র্যান্ড রোডের দিকে। বাবুঘাটের বাসগুমটির সামনে পৌঁছে সুব্রত বলল, যে-ভাবেই হোক ব্যাপারটা ম্যানেজ করবে, ঝগড়া কিন্তু একদম নয়।

খুব মিষ্টি করে হাসল রিমি। কারণ এরকম মিষ্টি করে অনেকদিন হল কেউ তাকে কিছু বোঝায়নি।

কার্জনপার্কের সামনে এসে প্রায় ফাঁকা একটা কালীঘাটগামী মিনিবাসে উঠে পড়ল দুজনে। ময়দানের ওপর দিয়ে পৌষের বাতাস এসে ঝাপট মারছে রিমির মুখে। হালকা শীত করছে। কেন জানে না এই শীত করাটাকে থ্রিল বলতে ইচ্ছে করছে রিমির। হাওয়ার ঝাপটায় কপালের ওপরে নেমে পড়া এলোমেলো চুলগুলো গুছিয়ে নিয়ে রিমি দু-চোখ অকারণেই হাসিতে ভরিয়ে তাকাল সুব্রতর দিকে।

সুব্রত বলল, তোমার ওই তিলটা জন্মগত?

রিমি অবাক হয়ে বলল, কোন তিলটা?

—ওই যে থুতনির ওপরে।

চমকে উঠল রিমি। কত মানুষের চোখের সামনে কথা বলেছে কিন্তু কেউ তো সুব্রতর মতো লক্ষ করেনি। একটু আগে প্রকৃতির যা বর্ণনা দিয়েছে সুব্রত তাতে রিমি বুঝেছে মানুষটা একজন অসাধারণ অবজারভার। তাই বলে এতটা! একটা কি দুটো ছুঁচের ডগায় যেটুকু জায়গা ধরে তার থেকে বড় নয় তিলটা। তবুও সুব্রতর চোখ এড়ায়নি। ভিতরে-ভিতরে মানুষটাকে ঘিরে আবার ভিজতে শুরু করল রিমি।

সুব্রত বলল, আজ নয়, প্রথমদিনই ওটা আমি লক্ষ করেছি।

রিমি উচ্ছল হেসে বলল, প্রথমদিন মানে?

—যেদিন সেই কুকুরছানাটা নিয়ে ক্রেশে যাচ্ছিলাম।

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে তো কয়েক মিনিটের দেখা, তার মধ্যেই নজর করে ফেলেছেন!

শুধু চোখে হাসল সুব্রত। খুব মায়া মাখানো স্বরে বলল, একটা কথা বলব, শুধু ওই তিলটাই তোমার মুখের একমাত্র ত্রুটি।

—তার জন্যে কী করতে পারি আমি। চোখে অভিমান এঁকে বাসের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল রিমি।

সুব্রত হেসে বলল, তোমার কিছু করার নেই বলেই তো আমি করেছি।

—মানে?

—সেদিন তোমার তিলটা দেখার পর থেকেই ভাবছিলাম কীভাবে ওটা মুছে ফেলা যায়। কী করি কী করি ভাবতে-ভাবতে ঠিক করলাম চেতলায় আদিনাথ কবিরাজের কাছে গেলে কীরকম হয়! ওনার কাছে অন্য ব্যাপারে দু-তিনবার গেছি। তা চলে গেলাম, বুঝলে। উনি বললেন, খাঁটি শ্বেতচন্দন বাটা যদি প্রতিদিন স্নানের পরে লাগানো যায় তবে নাকি তিল মিলিয়ে যায়...

শুনতে-শুনতে রিমি অবাক হয়ে যাচ্ছে। শ্বেতচন্দনের প্রলেপে তিল বিলুপ্ত হয় কী হয় না জানে না সে। জানার ইচ্ছেও নেই। শুধু একটা কথাই বাজছে ভিতরে। ওই টুকু তিলটা সুব্রতর ভিতরে অতখানি জায়গা নিয়ে বসে আছে! চেতলায় আদিনাথ কবিরাজের কাছে চলে গেছে! মিশব মিশব মিশব। বিড়বিড় করল রিমি। মা যাই মনে করুক সে সুব্রতর সঙ্গে মিশবে।

কন্ডাক্টর বলল, হাজরা মোড়।

সিট ছেড়ে উঠে পড়ল রিমি। পরের স্টপেজে নামবে। এগিয়ে যাওয়ার আগে পেছনে ঘুরে হাত নাড়ল রিমি। চমকে গেল ভিতরে সুব্রতর দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে। নিবিড় করে দেখছে

তাকে। একটু আগে যে নিবিড়তা নিয়ে গঙ্গার পাড়ে বসে প্রকৃতি দেখছিল। তখন ওর মুখে অদ্ভুত এক আলো দেখেছিল। সেই আলো আবার ভেসে উঠেছে সুব্রতর মুখে। শুধু দেখে। চোখের দেখা দেখে এত আনন্দ পায় মানুষ! কে জানে। বুকের মাঝখানটা বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছে। রিমি মিষ্টি হেসে বলল, সি ইউ....

সুব্রত হাসতে-হাসতে বলল, ঠিক আছে আগে নামো না হলে স্টপেজ পেরিয়ে যাবে।

একরাশ উচ্ছ্বলতা নিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেল রিমি।

॥ তিন ॥

ফ্ল্যাটের মেন দরজার ল্যাচে হাত দেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভেতরে-ভেতরে একটা তীব্র অস্বস্তিতে ভুগছিল রিমি। কিন্তু ল্যাচে হাত দিতে অস্বস্তিটা মুহূর্তেই উবে গেল। এ কি! দরজা খোলা কেন! কেউ এসেছে? আস্তে-আস্তে দরজাটা খুলল রিমি। ড্রয়িং কাম ডাইনিংয়ে কেউ নেই। দূরে মায়ের ঘরের খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেল আঙুল নেড়েনেড়ে কি যেন বলছে মা। এখান থেকেই মায়ের স্বর পাচ্ছে। কিন্তু কি বলছে কিছু বুঝতে পারছে না। শব্দগুলো মার ঘরের দরজাটা খোলা পেয়ে তোড়ে বেরিয়ে আসছে। একটা আরেকটার গায় ধাক্কা খাচ্ছে। দরজার পেছনে আলতো করে জুতো খুলে পা টিপেটিপে ড্রয়িং কাম ডাইনিংয়ের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল। এখন মা'র কথাগুলো অনেক স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মা ধমকাচ্ছে, ভুলে গেছ বলতে লজ্জা

করে না, নিজের কোন কাজটা ভোলো তুমি! কতদিন ধরে বলছি 'এস'-টা একটু ঠিক করে আনো, তা তো করলে না আমি নিজে দোকানে দিয়ে এলাম সেটাও একটু নিয়ে আসার সময় হচ্ছে না!

রিমি বুঝতে পারল 'এস'টা মানে মা সবসময় যে-চেনটা পরে সেটার হুকটা আর আংটা-টা বেঁকে গেছে। রিমিও শুনেছে কয়েকবার মা ওটাকে নিয়ে আসার জন্যে বাবাকে বলেছে। আজও কি একবার বলেছিল? মনে করার চেষ্টা করল। মনে পড়ল। হ্যাঁ মা বলেছিল। বাবা তখন বেরোনোর আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে ফাইনাল টাচ দিচ্ছে। দিতে-দিতেই বলেছিল হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন আর কিছু বলছে না। এখন একদম চুপ।

মা'র গলা আবার পেল রিমি। সময় হবে কি করে! ফোনে ধরার চেষ্টা করছি, কোনও সাড়া নেই! না কী রাজকার্য হচ্ছে! সহকর্মীর কবিতা শুনছেন...

এবার বাবার গলা পেল রিমি। তুমি ভাবছ তো আমি ভুলে গেছি, তা নয়। এই সময় বাসে কী ভিড় হয় তুমি জানো না, ভবানীপুরে যদি নামি ওখান থেকে আর আমার পক্ষে বাসে ওঠা সম্ভব নয়।

—কেন ফেরার সময় একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিলেই হয়।

—সোনার দোকান থেকে পুরোনো হার সারাই করে ফেরার জন্যে ট্যাক্সি!

—কেন! ভবানীপুর থেকে কালীঘাট কতটা।

—এখন উঠলেই কুড়ি টাকা, জানো?

—কেন জানব না! আমি কি দণ্ডকারণ্যে বাস করি?

—তাহলে!

—তাহলে আবার কি, গাঁটের কড়ি খরচা করে পত্রিকা ছাপিয়ে যাচ্ছ, কেন ছাপাচ্ছ আমি কি বুঝি না, ওই তপতী ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রেমটা যাতে চালু থাকে। প্রেম চালু রাখার জন্যে পয়সা খরচ করতে গায়ে লাগে না, আর বউয়ের জন্যে কুড়ি টাকা খরচ করতে গিয়ে পকেট থেকে হাত আর বেরচ্ছে না, বাঃ!

—কী যা তা বকছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! পত্রিকা প্রকাশ করা মানে তপতীর সঙ্গে প্রেম! ছিঃ-ছিঃ। সৃষ্টির গায়ে এরকম কালি লাগিও না।

—সৃষ্টি, ওই মহিলা ছাড়া আর কিছু এখন আছে তোমার মধ্যে! রিমির ওপরে বাজারের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার পরে আর তুমি বাজারের দিকে যাও? কিন্তু সেদিন ঘুম ভাঙতেই তো ছুটলে, না কী তপতীর শ্বাশুড়িকে ডাক্তার কুলেখাড়াপাতার রস খেতে বলেছে। ওদের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না তাই আনতে যাচ্ছি। বাঃ, আর আমার গলার হারের 'এস'-টার কথা মনে থাকছে না! মনে থাকলেও বাসে ভিড় হয়ে যাচ্ছে।

রিমি বুঝতে পারল কেন ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। বাবা ফেরার পরে মা এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে।

শুভেন্দু বলল, তুমি তো লেডিজ ক্লাবের ব্যাপারে প্রায় রোজই বের হও, মনে করে একটু নিয়ে আসতে পারছ না!

—কেন মনে করে আনব? কেন তুমি নিয়ে আসবে না!

রিমি শুনতে পেল মার স্বর সপ্তমে। ছাদের সিলিং ফাটিয়ে দেবে। মনে-মনে বলল এটাই ঘরে প্রবেশ করার যথার্থ সময়। বাবার ওপরে যেরকম চটে আছে তাতে বেঁচে যাবে রিমি। ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে ঘরের ভিতরে ঢুকে এল।

কাবেরীর দু-চোখের ভুরু ধনুক হয়ে উঠল যেন। চোখ বড়-বড় করে বলল, কোথায় ছিলিস এতক্ষণ!

—কেন! সাইবারজোনে!

—সাইবারজোনে কেন! বাড়িতে পি. সি. থাকতে বাইরে কেন!

—প্রিন্টারটা কাজ করছে না বললাম না।

—এই পৌনে এগারোটা পর্যন্ত!

—পৌনে এগারোটা পর্যন্ত কেন, ওখান থেকে দশটা কুড়িতে বেরিয়েছি।

কাকুলিয়া রোডে যে সাইবারজোনে রিমি যায় সেখান থেকে কালীঘাটে ফিরতে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগে। কাবেরী জানে। সেটা বোঝানোর কোনও মানে নেই। এত দেরি করে ফেরার জন্যে কোনওরকম অস্বস্তি বা সঙ্কোচ বোধ তো হচ্ছেই না রিমির, উলটে কাবেরী কি ভুল বলল সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছে। কাবেরী খুব ধীরে-ধীরে বলল, ঠিক আছে ধরে নিচ্ছি ওখানে তুমি দশটা কুড়ি পর্যন্তই ছিলে, সকালে বেরিয়েছ সোয়া বারোটা নাগাদ, এতক্ষণ কি করছিলে!

—কী আবার, নেট সার্ফ করে-করে যেগুলোর প্রিন্টআউট নেব বলে সর্ট করলাম, লোডশেডিং-এ সব উড়ে গেল।

—উড়ে গেল! ডানা মেলে?

—ডানা মেলে হবে কেন, সেভ করতে মনে ছিল না, কারেন্ট আসার পরে প্রিন্ট নিতে গিয়ে দেখি কিচ্ছু আসছে না, সারাদিনে যা সর্ট করেছি পুরোটা আবার করতে হল। গ্ল্যাক্সবেবির মতো মুখ করে কথাগুলো বলল রিমি।

তোড়ে বেরচ্ছিল একটা রাগ। হঠাৎ করে পাইপের মুখটা কে যেন চেপে ধরেছে। পাইপটা না ফেটে যায়। কাবেরীর মুখের অবস্থা তাই।

—মোবাইল অফ করে রেখেছিলে কেন! রিং করে না পেয়ে বাধ্য হয়ে সাড়ে ন'টা নাগাদ এস. এম. এস করলাম। সেটা রিসিভ করলে। ফের রিং করলাম পেলাম না। ব্যাপারটা কী আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

রিমি বলল, কী অবস্থায় ছিলাম আমি সেটা তো তোমায় বললাম, ওর মধ্যে কেউ মোবাইল খোলা রাখে। তুমি যখন মেসেজটা করেছ তখন কেন খোলা ছিল বলো তো, ভাবলাম এতক্ষণ বন্ধ তুমি যদি খোঁজ করো তাই খুলে ছিলাম।

—আমার মেসেজটা পেয়েছিলিস?

—না তো।

শুভেন্দু হেসে কাবেরীকে বলল, আর তুমি কী সব উলটো-পালটা ভাবছিলে! আরে বাবা রিমি ওরকম মেয়ে নয়, ওর একটা ভাবনাচিন্তা আছে, থিঙ্কিং আছে, ভুল ও করতে পারে না তা নয়, কিন্তু সহজে ও ভুল করবে না।

শুভেন্দু তাকাল মেয়ের দিকে। চোখে ভাসছে রিমিকে ঘিরে

প্রশংসার হাসি। কাবেরী এতে চটল আরও। রিমিকে দেখেই যে রাগে ফেটে পড়েনি তার কারণ অনিন্দিতা। ফোনে খবরটা দেওয়ার সময় পইপই করে বলেছে যা জানাল তা যেন রিমি না জানে। ভিতরের উত্তেজনার চাপে আনিন্দিতাকে দেওয়া কথাটা পুরো রক্ষা করতে পারেননি কাবেরী। ভেতরের চাপ থেকে এস. এম. এসটা করে ফেলেছিল। কিন্তু কোথাও সুব্রত নামটা উল্লেখ করেনি। টাইপ করেছিল ওল্ড হ্যাগার্ড। যে বোঝার সেই বুঝবে। তাকে ধরবে কে? এবারেও সেরকম একটা আড়াল থেকে খেলার চেষ্টা করল কাবেরী। মনে-মনে বলল, সারাটা দিন রিমিকে নিয়ে উদ্বিগ্নতায় ভোগার মধ্যে দিয়ে বুঝেছে দুম করে অ্যাটাকিং হয়ে কোনও লাভ নেই। এতে রিমি সচেতন হয়ে যেতে পারে। তাহলে তার পক্ষে ব্যাপারটাকে সামলানো আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু শুভেন্দু যে কথাগুলো বলল তাতে কী রিমি কিছু বোঝেনি। কচি খুকি তো আর নেই। একেবারে ধানিলঙ্কা হয়ে উঠেছে। এই বাড়ন্ত শরীরে স্কিন ফিটিঙস্ জিনস, উপচে পড়া বুক ডেনিমের লেবু হলুদ রঙের টিসার্টে ঢাকা। এই যে পৌনে এগারোটা করে ফেরা এগুলো কী ঠিক। কাবেরী বেশ রেগে গিয়ে বলল, সহজে ভুল করবে না, নাকি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ভুল করবে এতকথা আমি বুঝি না। আমি বুঝি মানুষ ভুল করে, আবার শুধরেও নেয়। যদি রিমি কোনও ভুল করে, রিমি শুধরে নেবে, কি তাইতো? মেয়ের মুখের দিকে তাকাল কাবেরী।

রিমি মনে-মনে হাসল। মার কথা গুলোতে অদ্ভুত কনফিডেন্স আছে। বাবাকে শাসন করে, বেণুদির লেডিজ ক্লাবের নানান কাজ

করে দিয়ে, সেখানেও বেশ কর্তৃত্বের জায়গায় চলে গিয়ে মা মনে করে আস্ত জগৎটাকেই নিজের শাসনে রাখতে পারে। কিন্তু এখন যে রিমি কোনও উত্তর দেবে না। রিমি ঠিক করে নিয়েছে কোনও তর্কে যাবে না। একটুও রাগবে না। বাস থেকে নামার আগে সুব্রত যে কথাগুলো বলেছে সেগুলো যেন রিমির মাথার মধ্যে ইনজেকশনের মতো ঢুকে গেছে। সুব্রত আজকের দেখা হওয়ার ব্যাপারে কোনও ধরনের কথা বলতে বারণ করেছে। এই প্রথম তাকে উত্তেজিত হতে রাগতে বারণ করল কেউ। অথচ সজল বলত গো অলআউট, অফেন্স ইজ দ্যা বেস্ট ওয়ে অফ ডিফেন্স। বলত, রোজ-রোজ মার কাছ থেকে অত কথা শুনতে যাবে কেন, বলে দাও আমাদের ব্যাপরাটা। উনি রাগলে তুমিও ফায়ার হয়ে যাবে। ফায়ার হয়ে গিয়েছিল রিমি। কিন্তু কী হল! সবকিছু তালগোল পাকিয়ে কীসব আজেবাজে ঘটনা ঘটে গেল। রিমির কেন জানি মনে হচ্ছে সুব্রত সজলের থেকে অনেক ভালো বোঝে জীবনটাকে। এই মানুষটার কথা শুনলে তার ভালোই হবে। বয়স বেশি বলেই কি? হবে হয়তো। যে কারণেই হোক না কেন তার মনে হচ্ছে কথাটা।

ভাজা মাছটা উলটে খেতে জানে না এমন মুখ করে রিমি বলল, শুধরে নেব মানে! এখন থেকে কম্পিউটারে কাজ করার সময় একটা পেজ শেষ হওয়ার পরে সেভ না করে অন্য পেজ-এ আর আমি যাই। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না। ক্লান্তির ভাব মুখের ওপরে মাখিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

কাউকে থাপ্পড় মারার পরে সে যদি কিছুই না করে, সে যে কী বিপদের এই মুহূর্তে বুঝতে পারছে কাবেরী। তার মানে রিমি এখন কোনও কথারই সরাসরি জবাব দেবে না। ঠিক আছে, যুদ্ধবিরতি যখন আমিও আর খেলছি না। আমার লেডিজ-ক্লাব আছে। সুব্রত রায়কে হাজরাপার্কের সামনে এমন ধোলাই দিয়ে দেব যে সুব্রত তো জব্দ হবেই বাবা-মেয়ে দুজনেই জব্দ হবে। কাবেরী কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে কিচেনে চলে এসেছিল। ওখান থেকেই বলল, খাওয়ার বাড়ছি, সকলে চলে এসো, আমি কিন্তু বারবার ডাকতে পারব না।

খাওয়াটা বেশ নীরবেই এবং দ্রুত সারা হয়ে গেল তিনজনের। কাবেরী শুধু একবার শুভেন্দুকে বলেছিল, বাড়িতে আর কবিতাপাঠের আসর করবে না!

শুভেন্দু অবাক হয়ে বলল, কেন!

—কেন আবার রাজ্যের লোক আসে, কে কীরকম আমরা জানি?

—তা জেনে আমাদের দরকারটাই বা কি! সকলে কবিতা পড়ে, সকলে শুনি. তারপর কে কী করল তা নিয়ে কার কী মাথাব্যথা!

—আর কারুর মাথাব্যথা না থাক আমার হচ্ছে। আমার বাড়িতে একজন বিবাহযোগ্যা মেয়ে রয়েছে, কে কী চোখে কখন কাকে দেখে কেউ বলতে পারে, ক্ষতিটা হলে তো আমার হবে...। প্রায় কেঁদে ফেলল কাবেরী।

শুভেন্দুর খাওয়া থেমে যায়নি। কিন্তু গতিটা কমে গেছে।

নাক টেনে নিয়ে কাবেরী বলল, যারা আসে তারা সবাই যে খারাপ আমি তা বলছি না, মানুষের মন, কখন কার মধ্যে কী হয় কেউ বলতে পারে...।

কাবেরী চোখ ঘুরিয়ে শুভেন্দু আর রিমিকে দেখে নিয়েছিল। তারপর বলেছিল, এই যে দীপালীদির এম. এ পাশ করা মেয়েটা ওদের পাশের বাড়ির ড্রাইভার ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে গেল। আমি তো ভেবে পাই না তোর পছন্দটা হল কী করে, তুই একটা লেখাপড়া জানা শিক্ষিতা মেয়ে আর তুই কিনা পালালি ওরকম একটা ছেলের সঙ্গে! সেন্স লেখাপড়া কিছুই তো কাজে দেয় না দেখছি....।

কথাগুলো শেষ করেই কাবেরী তাকিয়েছিল রিমির দিকে। রিমি বুঝতে পারছে যতই সে বলুক মার করা এস. এম. এসটা সে পায়নি, মা বুঝেছে ওটা রিমি পেয়েছে। আর বুঝতে পেরেছে বলেই আরও বুঝিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু যতই বোঝাক সে কিছুই বুঝবে না। সুব্রত বলেছে কোনও কিছু প্রতিষ্ঠা করতে গেলে গোপনীয়তার প্রয়োজন আছে। তাই চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল রিমি।

কাবেরী তবুও থামতে চায়নি। বলেছিল, আগে লোকে বলত বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা পরিয়ে দিয়েছে, এখন তো দেখছি মুক্ত নিজে-নিজেই বাঁদরের গলায় ঝুলে পড়ছে, ছ্যাঃ-ছ্যাঃ। কোনটা বাঁদর কোনটা মানুষ তাই বোঝে না....ছিঃ-ছিঃ।

রিমির মনে হয়েছিল সেই যেন দীপালীদির মেয়ে। আর কাবেরীই যেন দীপালীদি। না হলে দীপালীদির মেয়ের ঘটনায় মা এত রিঅ্যাকশান দেখাবে কেন! কিন্তু কাবেরীর ওই অস্বাভাবিক প্রকাশ ভঙ্গী, ওই নাটুকে ছিঃ-ছিঃ উচ্চারণ শুভেন্দু আর রিমির

সুবিধাই করে দিয়েছিল। যতটা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে চেয়েছিল তার থেকে বেশি তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারল।

এখন নরম বিছানায় গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছে রিমি। সারাদিনের ক্লান্তি, বাড়ি ফেরার পথে যে উদ্বিগ্নতা জন্মেছিল মাথার মধ্যে, তা ঘুম আনতে বিলম্ব করেনি। এখন গভীর ঘুমের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছে রিমি। পাতলা-পাতলা দীর্ঘ কতগুলো আঙুল তার সমস্ত মুখে চন্দনবাটা মাখিয়ে দিচ্ছে। আঙুলগুলো যে খুব সজীব তা নয়। আঙুলের চামড়া সামান্য কুঞ্চিত, হালকা হয়ে বয়সের ছাপ লেগে আছে সেখানে। ওই আঙুলগুলোর সঞ্চারেই অদ্ভুত এক প্রাণ খেলে উঠছে। কখনও সমস্ত মুখ সেই সঞ্চারে সিরসির করে উঠছে, পরমুহূর্তেই অদ্ভুত এক স্নিগ্ধতা সরু সুতোর মতো বয়ে যাচ্ছে সমস্ত মুখে।

আঙুলগুলো তার মুখে চন্দনবাটা লাগাচ্ছে বললে ভুল হবে, খুঁজে-খুঁজে ছোট-ছোট যত দাগ আছে তার ওপরে চন্দনবাটা লাগিয়ে দিচ্ছে। রিমি বসে আছে এক বিশাল বৃক্ষের নিচে পাথরের বেদির ওপরে। যে তার মুখে চন্দনবাটা লাগিয়ে দিচ্ছে তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না রিমি। দেখতে পাচ্ছে না মানে ঘুমের গভীরে স্বপ্নের ভিতরে মানুষটার মুখের আদল তৈরি হয়নি, শুধু দুটি হাত তৈরি হয়েছে। তাই রিমি বুঝতে পারছে না কে অমন মমতা নিয়ে মায়া নিয়ে পরমযত্নে তার গালে চন্দনবাটা মাখাচ্ছে। মুখ ভাসেনি স্বপ্নের ভিতরে, তাই চিনতে পারছে না মানুষটাকে। কিন্তু তার হাত দুটোর আচরণে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে রিমি। তার মুখে এত ছোটছোট দাগ আছে? কই ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ানোর সময়

কোনওদিনও তো চোখে পড়েনি! আচ্ছা দাগগুলো নয় আছে, আছে তো তার মুখে, কিন্তু ওই আঙুলগুলো সে কথা জানল কী করে! কে ও! ঘুম ভেঙে গেল রিমির।

বিছানার ওপরে উঠে বসতে চোখ ছুঁয়ে গেল হালকা অন্ধকারে। পুণা থেকে আসার পরে এ-ঘরে নাইটল্যাম্পটা চেঞ্জ করে দিয়েছে বাবা। আগে ছিল হালকা নীল। এখন হালকা সবুজাভ এক আলো বের হয় নাইটল্যাম্পটা থেকে। আলোটা আগের থেকে বেশি স্নিগ্ধতা ছড়াচ্ছে ঘরে। গলার ভিতরটা কাঠ হয়ে গেছে। তাই কি স্নিগ্ধতাটা ভালোলেগেও লাগছে না রিমির! ভালো করে আলোটা দেখার ইচ্ছে থাকলেও দু-চোখের পাতা মুড়ে ফেলল। বিছানা থেকে নেমে ড্রেসিংটেবিলের ওপর থেকে জলের বোতল তুলে নিল রিমি। আলতো করে তিন-চার ঢোক খেল। সাদারঙের ছিপি বন্ধ করে নামিয়ে রাখতে গেল। পারল না রিমি। ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসছে মায়ের স্বর। মা এখনও জেগে! ক'টা বাজে? দেয়ালের দিকে তাকাতে ওয়ালক্লকের আর্মগুলো স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। দেড়টা না আড়াইটে? সঠিক করে বোঝার জন্যে মোবাইলের বোতাম টিপল। কিন্তু সময় দেখবে কি! মিসড কল হয়ে রয়েছে। কিন্তু এত রাতে কে ফোন করল! নম্বরটা দেখল রিমি। চিনতে পারছে না। কয়েক মুহূর্ত ভেবেও রিমি বের করতে পারল না কার নম্বর। বোতাম টিপে সময় দেখল। একটা সাঁয়ত্রিশ। মা এখনও কী বকবক করছে! নাম্বারটা কার সেটা যখন বোঝা যাচ্ছে না তাহলে আপাতত থাক। মা কী বকছে সেটা আগে জানা যাক। নম্বরটা তো মোবাইলে আছেই। পা টিপেটিপে নিজের

শোওয়ার ঘরের দরজার সামনে চলে এল রিমি। আলতো করে ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এল ডাইনিংস্পেসে।

মার ঘরের দরজা ভেজানো। সরু ফাঁকের সামনে এসে কান পাতল রিমি। শুনতে পেল মা বলছে ঃ তখন সজলের সঙ্গে ওর সম্পর্কের ব্যাপারে ওভাবে বাধা না দিলেই বোধহয় ঠিক ছিল...

রিমি শুনতে পেল বাবা বলল, সেটা এখন ভেবে লাভ?

—লাভ লোকসানের কিছু নেই, আমি শুধু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি।

—কী ব্যাপার?

—ও সুব্রতর সঙ্গে সম্পর্কটা তৈরি করল কেন!

—তৈরি হয়েছে কিনা সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না, সেখানে কেন তৈরি হলটা আসছে কোথা থেকে!

—তুমি যে কীসের কবিতা-গল্প লেখো ভগবান জানে, তুমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারছ না? এ ধরনের কথা শোনার পরে কোনওদিনও তুমি ওকে এত শান্ত থাকতে দেখেছ?

শুভেন্দু বিরক্তির স্বরে বলল, মনে পড়ছে না।

—তা কী করে মনে পড়বে বলো, কোনওদিনও কী মেয়ের জন্যে মেয়ের মায়ের জন্যে তোমার সময় হয়েছে যে তাদের তুমি নজর করবে।

উত্তরে রিমি বাবার গলা শুনতে পেল না। রিমি জানে সত্যি বাবার কাছে কোনও উত্তর নেই। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে দেখে আসছে মায়ের একই অভিযোগ। একটা অভিযোগ এতটা কাল

স্থায়ী হতে পারে না যদি না তার ভিতরে সত্যি থাকে।

শুভেন্দু চুপ করে গেল বলে কাবেরী কথা বলায় খুব উৎসাহ খুঁজে পেয়েছে। বলল, আমি শুধু একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না ঠিক কোন বিষয়ে রিমি সুব্রতর ব্যাপারে ইনটেরেস্টেড হল!

রিমি বাবার গলা পেল না। কাবেরী নিজেই বলে চলেছে, ওই তো চেহারা, অল্পবয়সি তো দূরের কথা বুড়িদের কাছেও পাত্তা পাবে না, চাকরিবাকরি কিছু নেই, থাকার মধ্যে তো গঙ্গার ধারের জয়েন্টপ্রপার্টিতে একখানা ঘর, তিন বউদির কাছে তিনবেলা খাওয়া—সেই মানুষটাই অ্যাট্র্যাক্ট করল রিমিকে! জাস্ট ভাবা যায় না!

উলটোদিক থেকে কোন উত্তর আসছে না বলে কাবেরীর কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। মনে হয় বকতে-বকতে দমে ঘাটতি পড়েছে। দম নিয়ে কাবেরী বলল, আমার মনে হয় ও রিমিকে ওর সম্পর্কে কিছু জানায়নি। উলটে নিজের সম্পর্কে বানিয়ে-বানিয়ে অনেক বড়-বড় কথা বলেছে এবং মেয়ে তাতেই ইমপ্রেসড্...

ছিঃ-ছিঃ। মনে-মনে বিড়বিড় না করে পারল না রিমি। মা কি একটুও পালটাবে না। না জেনে, কতগুলো অলীক ভাবনা থেকে মানুষটার সম্পর্কে যা-তা বলে যাচ্ছে! মা কী জানে পুণা থেকে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় আসার পরে এই যে তিনমাস কেটে গেল তার মধ্যে কাল দুপুরেই প্রথম মনে একটু শান্তি পেয়েছে। সুব্রত-র সঙ্গে গঙ্গার ধারে ওই পার্ক মতো জায়গাটাতে যতক্ষণ কাটিয়েছে ততক্ষণ বেশ একটা তৃপ্তির মধ্যে ডুবেছিল। কীসের তৃপ্তি? কেউ জিগ্যেস করলে বলতে পারবে না রিমি। ভালো-ভালো খাওয়ার

খেলে একরকমের তৃপ্তি হয়। ভালো ঘুম হলে একটা তৃপ্তি হয়। সুন্দর একটা দুল পরলে একরকম তৃপ্তি। সেরকম কারুর কথা শুনলে কোন তৃপ্তি হয়? কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কোন তৃপ্তি হয়? কারুর দিকে তাকানো নয়, কেউ তার দিকে তাকিয়ে থাকল, এতে তার তৃপ্তি হবে? হবে হয়তো, না হলে এই জিনিসগুলোই তো ঘটেছে কাল সারাটা দুপুর।

মা বিশ্বাসই করতে পারবে না, নিজের সম্পর্কে বড়-বড় কথা তো দূরের কথা, মেজকথা ছোটকথা কোনও কথাই আসলে বলছিল না সুব্রত। সুব্রত তখন কথা দিয়ে ছবি আঁকছিল। জায়গাটাতে আসাব পরপরই পার্শ্ববর্তী মাঝারি উচ্চতার একটি গাছের হাওয়ায় দোল খাওয়া পাতার দিকে তাকিয়ে বলেছিল গাছেদেরও জানো তো আমাদের মতো স্কেলিটন থাকে।

কৌতুকে নয়, যেন বিশ্বাস করেই রিমি বলে উঠেছিল, তাই...! আসলে কথাগুলো বলার সময় সুব্রতর স্বরে এমন একটা প্রত্যয় লেগেছিল যে 'তাই'-টা না বলে পারেনি রিমি।

সুব্রত আঙুল তুলে হাওয়ায় দোল খাওয়া গাছের পাতা দেখিয়েছিল। পাতাগুলোর শিরা বড় স্পষ্ট। ওটা দেখিয়ে সুব্রত বলেছিল মাঝখানের প্রধানশিরা থেকে শাখা শিরাগুলো যেভাবে বেরিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে না বুকের পাঁজর।

রিমি মনে-মনে বলেছিল সত্যি তো।

সুব্রত বলেছিল পাঁজর, সবুজ বুকের পাঁজর। তারপর বলেছিল গাছটার কীরকম নোখ হয়েছে দেখছ, আবার নেলপলিস লাগিয়েছে!

সুব্রতর ব্যাপারে একটার পরে আরেকটা মুগ্ধতা উঠে আসছিল। যেন সমুদ্রের ঢেউ। পলকে-পলকে চমকে দেয়। গাছেদের নোখ শুনে অদ্ভুত লেগেছিল, তারপর ভালো লাগল 'পলিস' উচ্চারণটা শুনে। আই. সি. এস. ই. কারিকুলামে পড়া মেয়ে সে। লোকের মুখে 'পালিস' শুনলে খারাপ লাগে। এই খারাপ লাগাটাই সচরাচর ঘটে। সেখানে 'পলিস' শুনে একটু অবাক হয়েছিল। ভালোলাগার সঙ্গে জিগ্যেস করেছিল, আপনার কি ইংলিশ মিডিয়াম?

সুব্রত আঙুল দিয়ে গালের দাড়ি আলতো চুলকে বলেছিল, পাতি বেঙ্গলি ব্র্যান্ড ম্যাডাম। তবে তোমাদের বাড়িতে মাসে একবার ভিড় জমায় না সব, কাঁধে ব্যাগ, দড়িওলা চশমা, ফ্রেঞ্চকাট, লক্ষ্ণৌই জহরকোট, চিবিয়ে ইংরেজি কবিতা আওড়ান, ওদের থেকে ইংরেজিটা আমি ভালো জানি। তারপর বিরক্ত হয়ে বলেছিল ইংলিশ মিডিয়াম বেঙ্গলি মিডিয়াম রাখো না, গাছের নোখ দেখালাম সেদিকে চোখ গেল না যত সব হাবিজাবি বকছে। প্রকৃতির দিকে তাকাও দেখবে প্রকৃতির কোনও মিডিয়াম নেই, প্রকৃতির একটাই মিডিয়াম। কিলিম্যাঞ্জারোর তুষার আর হিমালয়ের তুষার কি আলাদা! একই বরফ দিয়ে আফ্রিকা সেজেছে আবার এশিয়াও সেজেছে। ব্যাপারটা কী সুন্দর না...রিমির চোখের ওপরে চোখ রেখে হেসেছিল সুব্রত।

কিছুই নেই ও মুখে। বয়সি ত্বক, কয়েক দিনের না কামানো কাঁচাপাকা দাড়ি, ভাসা-ভাসা চোখ, ওই হাসি—সব মিলিয়ে খুব ভালো লাগছিল রিমির। একটা ধূপ জ্বলছে। কিন্তু সেটা ঘরের

কোথায় রাখা আছে দেখা যাচ্ছে না। তার সুন্দর গন্ধে ভরে আছে ঘর। অজানা একটা সুখ যেমন মানুষকে টানে তেমনই যেন টেনেছিল রিমিকে। খুব ভালোলাগছিল।

এই যে পুণা থেকে চলে এসেছে, একরকম বাধ্য হয়েই এসেছে। সেটা এখনও পর্যন্ত কাউকে বলতেও পারেনি। খুব গভীরে রিমির মনটা একেবারে চটকে রয়েছে। নিজেই যোগাযোগ করে বিভিন্ন জায়গায় ডিজাইন পাঠাচ্ছে। সাড়াও পাচ্ছে। তাতে যা আসে তাতেই রিমি তৃপ্ত। তাই কাজের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনও তাগিদ নেই ভিতরে। বরঞ্চ কাজের সময় বাঁচিয়ে আজকাল কিছুটা সময় নিজের মতো করে ঘুরে বেড়ায়। সেটা যে পুরোটাই অকাজের তা নয়। এই ঘোরার মধ্যেই রিমি রেখে দেয় কলকাতার যেসব গার্মেন্টিস ম্যানুফ্যাকচারার তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় তাদের অফিসে যাওয়ার ব্যাপাবটা। সবসময় যে কাজের কথা তোলে তা নয়। কখনও নিছক আড্ডা দেওয়া। বাড়িতে পি. সি. থাকলেও সাইবারজোনে গিয়ে একটু সার্ফিং করা। ফুটপাত ধরে এলোমোলো হাঁটা। সকালে বাজার যাওয়া।

আসলে এসব তো মনের ট্রিটমেন্ট। ভিতরের সেই চটকে থাকা মনটাকে ঠিক করে নেওয়ার প্রক্রিয়া এটা।

আর মা এগুলো সহ্য করতে পারছে না। আজ মা বাবার ওপর চিৎকার করেছে, এখন এই রাত দুটো পর্যন্ত বকবক করছে, কিন্তু এর আগেও তো মার চোখে তীব্র রাগ দেখেছে। পুণা থেকে চলে আসার কয়েকদিন পর থেকেই তো তার উদ্দেশ্যে মায়ের চোখ থেকে এই রাগটা ভেসে আসছে। মা'র চোখ দুটো যেন শুধু বলছে

তুমি তোমার সমস্ত পোটেনসিয়ালিটিটা পুরো কাজে লাগাচ্ছ না। এটা যে কতবড় ভুল করছ তুমি কল্পনাও করতে পারছ না। রিমি যেন খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে আর সেটা যেন রিমি জানে না।

রিমি ঠারে-ঠোরে বোঝানোর চেষ্টা করেছে পোটেনসিয়ালিটির সমস্তটাই যদি ব্যবহার করি তার বিনিময়ে যা আসবে তা তো প্রচুর, অতটা রাখব কোথায়!

মা-ও ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে বোকার মতো কথা বোলো না, মানুষ লেখাপড়া শেখে কেরিয়ার বানায় একটা জায়গায় থেমে থাকার জন্যে নয়, রিমি তো কিছুতেই বলতে পারেনি এগোতেই তো গিয়েছিলাম মা, এগোতে গিয়ে পুণার অফিসের ড্রয়ারে আমি লেডিজ কনডোম খুঁজে পেলাম। সেই বলতে না পারা কথা সবসময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় রিমি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে মা কী একদিনের জন্যে একবারের জন্যেও বুঝতে পেরেছে! অথচ সেদিন সুব্রত কুকুরছানা রাখতে যাওয়ার সময় অন্য কথার মাঝখান থেকে হঠাৎ করেই রিমির চোখের ওপরে চোখ রেখে বলে উঠেছিল, আর ইউ ইন এনি প্রবলেম? রিমি চমকে উঠে বলেছিল, কেন! সুব্রত বলেছিল সবসময় নয়, মাঝে-মাঝে তোমার চোখের দিকে তাকালে মনে হয় তুমি কোনও সমস্যায় আছ...। রিমি অবাক হয়ে বলেছিল, মাঝে-মাঝে মানে?

—সেদিন তোমাদের বাড়িতে কবিতাপাঠের আসর ছিল না...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—সেদিন তো তোমাকেও আমি দেখছিলাম, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমি সত্যি কথাটা বলব...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না। রাস্তায় হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাওয়া, বাবার বন্ধু অথচ কুকুরছানা ক্রেশে রাখতে যাচ্ছে—সব মিলিয়ে মানুষটা তখন বেশ মজা নিয়ে ভেতরে গেঁথে গেছে। তার ওপরে রিমির ভেতরে লুকিয়ে রাখা প্রবলেমটার সন্ধান পেয়ে গেছে যে-মানুষটা তার কথায় মাইন্ড করবে কি! তাই স্বাভাবিক ভাবেই হ্যাঁ-হ্যাঁ বলেছিল।

সুব্রত বলেছিল, দেখছিলাম বললে ভুল হবে, আসলে তোমাকে আমি অবজার্ভ করছিলাম, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে কফির ট্রে নিয়ে ঢুকলে, সবার সামনে এগিয়ে ধরছ, প্রতুলবাবুকে এগিয়ে দেওয়ার সময় ওনার পাশে রাখা ওনার কবিতার বইয়ের ওপরে তোমার পা পড়ল, তোমার খেয়াল নেই। পরেরবার আবার ট্রে নিয়ে ঢুকলে, এগোতে গিয়ে তোমার পা বইয়ের ওপরে পড়ল, তোমার খেয়াল হল না। তিনবারের বার যখন পা পড়ল তোমার খেয়াল হল, তুমি নিচু হয়ে বইটা নমস্কার করতে গেলে আর প্রতুলবাবু কীরকম রাগ দেখিয়ে বইটা তোমার নাগাল থেকে সরিয়ে নিলেন! কথা শেষ করে সশব্দে হেসে উঠেছিল সুব্রত।

রিমি একটুও হাসতে পারেনি। খুব অবাক হয়ে গিয়ে বলেছিল, এটা আপনি অবজার্ভ করেছেন! আপনি তো হাঁ হয়ে বাবার কবিতা শুনছিলেন?

—তুমি কখনও ফিল্মের শুটিং দেখেছ?

রিমি মাথা নেড়ে না জানিয়েছিল।

সুব্রত বলেছিল, গেলে দেখবে এক সঙ্গে বারো-চোদ্দোটা ক্যামেরা চলছে, চারদিক থেকে ছবি নেওয়ার চেষ্টা চলছে, আমার মাথার চারপাশে ক্যামেরার মতো চোখ লাগানো আছে, চারপাশের কোনও কিছু আমার নজর এড়ায় না।

অবাক হয়ে থমকে যাওয়া রিমির দিকে তাকিয়ে সেদিন সুব্রত কী বুঝেছিল নিজেই জানে। শুধু বলেছিল, আমার না প্রতুলবাবুর ওপরে খুব রাগ হচ্ছিল, উনি একজন কবি অথচ তোমার চোখদুটো দেখে একবারের জন্যেও বুঝতে পারল না তুমি একটা প্রবলেমে আছ!

রিমির বুকের ভেতরে হঠাৎ করে একটা ঢেউ উঠেছিল। বলে দেবে নাকি একে যে-কথাটা পুণা থেকে ফেরার পরে কাউকে বলতে পারেনি? কিন্তু পরের মুহূর্তেই সামলে নিয়েছিল। এটুকু আলাপের মধ্যে দিয়ে অতটা আস্থায় চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। মুখ চোখে একটা বাড়তি সতেজতা এনে বলেছিল, আপনি যেভাবে সবকিছু অবজার্ভ করেন তাতে খুবই ভালো লাগছে আমার, কিন্তু কথা হল আমার কোনও প্রবলেম নেই।

—ও! খুব ম্লান স্বরে বলেছিল সুব্রত।

রিমির মনের ভিতরটায় যেন এক সুইট এ্যান্ড সাওয়ার ডিশ তৈরি হচ্ছিল তখন। ব্যথা প্রকাশ করতে না পেরে কষ্ট হচ্ছিল আবার সুব্রত তাকে এমন নিবিড়ভাবে অবজার্ভ করছে ভেবে একটা সুখবোধও হচ্ছিল। সত্যি তো, এর আগে কেউ তো এমন নিবিড় করে লক্ষ করেনি! এই যে মা নানান কথার মাঝে বলে মেয়েকে দেখতে হয়েছে, মেয়েকে মানুষ করতে হয়েছে, কিন্তু আজকাল মা

তাকে কী দেখে, কতটা নজর করে, চোখের দিকে তাকায়? বোঝে কিছু? অথচ যে মানুষটা দেখে, তাকে অমন নিবিড় করে অবজার্ভ করে, তাকে এই মধ্যরাতে গালাগাল দিচ্ছে! পাগলের মতো মাথা খুঁড়ছে, কেন রিমি সুব্রতর ব্যাপারে অত ইনটেরেস্টেড!

রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে রিমির। কিন্তু রিমি যে এবার, মানে জীবনে প্রথমবার ভেবেচিন্তে মাথাটা ঠান্ডা করে ফেলেছে। রাগবে না সে কিছুতেই। বরঞ্চ ঘুম যখন ভেঙেই গেছে, শব্দ না করে ডাইনিঙে চলে আসা গেছে তখন বাবা-মায়ের ঘরের ভেজানো দবজার সামনে দাঁড়িয়ে আরও কিছু কথা শুনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কথাগুলো তার আগামী যুদ্ধে কাজে লাগবে।

ভেজানো দরজার সরু ফাঁকে কান পাতল রিমি। শুনতে পেল বাবা বিরক্ত হয়ে বলছে, আচ্ছা তোমার যখন এত চিন্তা, তুমি ঘুমতে পারছ না, তখন রিমিকে জিগ্যেস করো সরাসরি। সেটাও করবে না আর আমার কান দুটো খারাপ করবে....

মার গলা পেল না রিমি। আবার পেল বাবার গলা। বাবা বলল, আচ্ছা সকালে উঠে তো আলোচনা করলে হয়, এখনই আলোচনা করতে হবে! কাল অফিস আছে, এখন প্রায় আড়াইটে বাজে!

—বাজুক, সকালে আলোচনা করবটা কী করে! রিমি সব শুনতে পাবে না, এতে তো ও আরও কশাস হয়ে যাবে...।

কয়েক মুহূর্ত মার স্বর শুনতে পেল না রিমি। ফের শুনল মা কাঁদছে। ফুপিয়ে-ফুপিয়ে মা বলল, এভাবে আমার সব স্বপ্ন পুড়ে

ছাই হয়ে যাবে আমি কি কোনওদিনও ভেবেছিলাম!

বাবা বিরক্ত হয়ে বলল, এতটা ভেঙে পড়ার কী হল আমি তো বুঝতে পারছি না। একজন বাসের জানলা দিয়ে কয়েক সেকেন্ড কি না কী দেখে তোমাকে একটা খবর দিল আর তা নিয়ে মাথা খারাপ করে এখন তুমি নিজের ঘুমের বারোটা বাজাচ্ছ। যে খবরটা দিল সে কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে।

—অনিন্দিতা নিশ্চিন্তে ঘুমবে না কী আমি ঘুমব, ওরও তো মেয়ে আছে, কই সে তো একটা ওল্ড হ্যাগার্ডের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছে না!

রিমি ফের মার ফুপিয়ে-ফুপিয়ে কান্নার শব্দ পেল। ভেজানো দরজার সরু ফাঁকের সামনে থেকে সরে এল রিমি। আর ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। যা তার জানার জানা হয়ে গেছে। তার মানে মার বন্ধু অনিন্দিতামাসিই কালপ্রিট। অদ্ভুত মহিলা তো! তাদের বাড়িতে সেই স্কুল লাইফ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওনাকে দেখছে, রাস্তায় তাকে আর সুব্রতকে দেখে কোনও কিছু যদি খারাপ লেগে থাকে তবে তাকেই বলতে পারত, মাকে জানানোর কি ছিল! এরা বয়সে বড় এদের কাছ থেকে কী শিখবে রিমি।

বিছানায় এসে শোওয়ার পরে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘুম চলে এল রিমির। আর ঘুমের সাথে-সাথেই চলে এল সেই স্বপ্নটা। সরু-সরু দীর্ঘ বয়সি আঙুলগুলো পরম যত্নে তার মুখের ওপরে চন্দনবাটা লাগিয়ে দিচ্ছে। খুঁজে-খুঁজে বিন্দু-বিন্দু দাগগুলো বের করছে আর দাগগুলোর ওপরে বিশেষ করে প্রলেপ দিচ্ছে। তার

মুখের ওপর থেকে দাগগুলো মুছে ফেলার ব্রত নিয়েই যেন আঙুলগুলো তার কাজ করে চলেছে। কার আঙুল ওগুলো? তার মুখের ওপরের যাবতীয় দাগ মুছে দিয়ে ওর লাভ? আঙুলগুলো যার, তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না বলে প্রশ্নগুলো যেন বাববার ফিবে আসছে। অসহ্য একটা অনুভূতি চারিয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্কের কোষ থেকে কোষে। ব্যথা নয় জ্বালা নয়, ঠিক কী বুঝতে পারছে না বিমি। কিন্তু অনুভূতিটা অসহ্য।

বিছানার ওপরে ধরমড়িয়ে উঠে বসল রিমি। সকাল এগারোটার কড়া রোদ ব্যালকনির দিক থেকে ডানা মেলে উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার বিছানার ওপরে। তাকাতে কষ্ট হল রিমির। রাতে বলতে গেলে ঘুমই হয়নি। তার ওপরে কড়া রোদ চোখে এসে পড়ায় দুটো চোখ করকর করে উঠল রিমির। চোখ গিয়ে পড়ল বিছানায় পড়ে থাকা মোবাইলটার ওপবে। চোখের করকর করা ভাবটা মোছার জন্যে মোবাইলটা তুলে নিল রিমি। বোতাম টিপে স্ক্রিনের ওপরে চোখ রাখল। এলোমেলো টিপছিল। মিসকলে এসে থমকে গেল। সেই নম্বরটা দেখতে পেল রিমি। কাল রাতে ঘুমের ঘোরে এসেছিল। সে জানতে পারেনি কার কল। এখনও বুঝতে পারছে না।

স্বপ্নের সেই আঙুলগুলোর মতো আরও একটা কাঁটা ধীরে-ধীরে ফুটে যাচ্ছে। হঠাৎই ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ হয়ে গেল কপালের ভিতরে। রিমির চোখ থেকে সব করকরে ভাব মুছে গেল মুহূর্তেই। এটা তো সজলের নাম্বার। এতদিন পরে! আর জানলই বা কী করে তার নম্বর? তার মানে সে কলকাতায় আছে এটাও জানে। এতক্ষণ

মাকে নিয়ে, সুব্রতকে নিয়ে, পুণা থেকে ফিরে আসার অসহ্য কারণ—এইসব মিলিয়ে যে কাঁটাভূমির ওপর দিয়ে হাঁটছিল, সেই কাঁটাভূমি থেকে আরেকটা, মানে একটা নতুন কাঁটাগাছ উঠে এল রিমিকে আঁচড়াবে বলে। মোবাইলের স্ক্রিনের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল রিমি। দু-চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল। বন্ধ না করে পারল না।

॥ চার ॥

—দেখ কাবেরী তোরও পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর সংসার করা হয়ে গেল আমারও হয়ে গেল, পুরুষমানুষ মেয়েদের মুখে আইসক্রিম তুলে দিচ্ছে তার মানেটা কী সে তুইও বুঝিস আমিও বুঝি, সেটা বোঝার জন্যে বাস থেকে নেমে ওদের সামনে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে কি!

কাবেরী ভেতরে আবার ঝিমিয়ে পড়ল। শুভেন্দু অফিসের জন্যে বেরিয়ে যাওয়ার পরে আর তর সয়নি। রিমিকে ঘুমতে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল। যাক মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। কার কাছে যাচ্ছে তার আঁচ পাওয়ার কোনও সুযোগই নেই। আসার পথে মনে-মনে বিড়বিড় করছিল। অনিন্দিতার কাছে পৌঁছে ওরসঙ্গে কথা বললে নিশ্চয়ই জানা যাবে অনিন্দিতা ব্যাপারটা ভালোভাবে লক্ষই করেনি। কি দেখতে কি দেখেছে। কিন্তু দু-চার কথার পরে এই যে কথাটা বলল অনিন্দিতা তাতে ঝিমিয়ে পড়েছে কাবেরী। সকালে ফোনে বলেছিল দুজনে গায়ে গা লাগিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছিল, এখন তো বলল সুব্রত রিমিকে আইসক্রিম খাইয়ে দিচ্ছিল।

আমতা-আমতা করে কাবেরী বলল, সকালে তুই যে বললি গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিল এখন বলছিস খাইয়ে দিচ্ছিল—বুঝলাম না ঠিক....

—না বোঝার তো কিছু নেই, তখন ডিটেলে বলিনি কারণ অতটা শুনলে তুই ধাক্কা খেতিস। গায়ে গা লাগিয়ে শুনেই তো তোর হয়ে গেছে, অতটা শুনলে কী হয়ে যেত কে জানে, তারপর আমি অপরাধী হয়ে থাকতাম।

অনিন্দিতা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছে। অথচ সেই মানুষটার সঙ্গেই তাকে জোট বাঁধতে হবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। ভিতরের ভাঙাচোরা ভাবটা ঠিক করে নিয়ে কাবেরী বলল, কী করা যায় বলত?

—কী আবার করা যাবে, ধরে আচ্ছাসে ধোলাই দিয়ে দে।

কাবেরী স্বল্প রেগে গেল। বলল, ধরে ধোলাই দিলেই হল, এখনও পর্যন্ত কোনও প্রুফ নেই হাতে।

—প্রুফ মানে! আমি যে দেখেছি সেটা মিথ্যে!

—তুই বলবি?

—কেন বলব না! তুই ডাক না সুব্রতকে, ব্যাটার মাথায় ঘোল ঢেলে ছাড়ব। ইনটেলেকচুয়াল! রোম্যান্টিক! আসলে যে একটা বদের ধাড়ি সেটা সকলের সামনে প্রমাণ করে ছাড়ব।

—দাঁড়া, একদিন সুব্রতকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলি, ও এলেই তোকে ফোন করব, আর রিমিও থাকবে, একদিনে দুজনকেই শিক্ষা দেওয়া যাবে।

মধু আর পাতিলেবুর রস দিয়ে সরবত বানিয়েছে অনিন্দিতা।

তাতে মাঝে-মাঝে মৃদু চুমুক দিচ্ছে। এটা মেদ কমিয়ে শরীর ছিপছিপে রাখার জন্যে খায়। সরবতের গ্লাসটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে বলল, তুই কোনওদিন কোনও প্রবলেম সলভ করতে পারবি না। কেন বলত?

রাগ বিরক্তি নিয়ে শুধু তাকিয়ে রইল কাবেরী।

অনিন্দিতা বলল, কোনও সমস্যায় পড়লে এত উত্তেজিত হয়ে পড়িস যে তোর মাথার ঠিক থাকে না।

—মাথা ঠিক না থাকার কী হল!

—এই যে তুই বলছিস রিমির উপস্থিতিতেই তুই আমাকে ডাকবি, সুব্রতকে ডাকবি, এটা কি বলছিস! রিমির প্রেজেনসে আমি এসব নিয়ে আলোচনা করব! রিমি আমার সম্পর্কে কী ভাববে সেটা একবারও মাথায় এল না তোর! সত্যি...

কাবেরী অবাক হয়ে বলল, ভাববে আবার কী! তুই তো আর মিথ্যে কিছু বলছিস না...

—ব্যাপারটা সত্যি মিথ্যের নয়, রিমি ভাববে না কে কার সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি...

—ঘামাচ্ছিস! রিমি আমার মেয়ে, তোর মেয়ের মতোই, তার ভালোমন্দ নিয়ে তুই মাথা ঘামাতেই পারিস!

—না ঘামাতে পারি না, আফটার অল এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি এটা নিয়ে তোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছি, ও যদি এটা জানতে পারে তবে ওর কাছে আমি খারাপ হয়ে যাব কাবেরী।

প্রথমটায় কাবেরী কিছু বলতে পারল না। জীবনের এতগুলো

বছর পার করে এসেও অনিন্দিতার এখনও সকলের কাছে ভালো থাকার ইচ্ছে! অনিন্দিতা কি স্বর্গে গিয়ে ভোটে দাঁড়াবে! সবাই যখন স্বর্গে যাবে তখন সকলেই যেন অনিন্দিতাকে ভোট দেয় তার জন্যে এই ভালো থাকার আকাঙ্ক্ষা? কিছুই বুঝতে পারে না কাবেরী। রেগে গিয়ে বলল, রিমির কাছে খারাপ হয়ে গিয়েও যদি ওকে তুই খারাপ রাস্তা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারিস তবে তোর ভালো লাগবে না?

—কেন লাগবে না, কিন্তু আমি বলতে চাইছি ওর কাছে খারাপ না হয়েও ওকে আমি ভালো রাস্তায় আনতে পারি।

—কী করে?

—দুজনে মিলে সুব্রতর বাড়িতে যাই চল, বাঁদরটাকে এমন ধমক দেব যে জীবনে আর তোর মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস হবে না।

—তুই সুব্রতর বাড়ি চিনিস?

—কেন চিনব না!

—কী করে চিনলি?

—কেন! কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে গেছি কতবার, মন্দিরের কাছেই তো ওদের বাড়ি। ওকে তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

—ও। এটুকু বলেই কাবেরী থেমে গেল।

অনিন্দিতা বলল, কী ঠিক করলি, যাবি? দেখ ও আজ তাড়াতাড়ি অফিসে বেরিয়েছে, আমারও হাত ফাঁকা, যাবি তো চল।

কী উত্তর দেবে কাবেরী বুঝতে পারছে না। বাড়ি গিয়ে ধমক-ধামক দিলে শেষে হিতে বিপরীত না হয়ে যায়। শুভেন্দু, রিমি দুজনের কাছেই তাহলে খারাপ হয়ে যাবে। কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে সেই পুরোনো কথাটাই নিজের ভেতর থেকে বের করে আনল কাবেরী, বলল, আমি শুধু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না অনি, সুব্রতর মতো একটা লোককে রিমির পছন্দ হল কী করে রে!

—হবে না, আধদামড়াটার আর কিছু না থাক কথা বলতে পারার খুব গুণ আছে।

—কথা বলতে পারার?

—আরে বাব্বা! কি সুন্দর কথা বলে তুই জানিস না, তোর অবশ্য ব্যাপারটা জানা উচিত ছিল, তোদের বাড়িতে এত যাতায়াত...

সুব্রত তাদের বাড়িতে বিভিন্ন সময় কবিতাপাঠের আসরে এসেছে, শুভেন্দুকে ওর পত্রিকার প্রুফ দেখার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে এসেছে। লোকটাকে কাবেরীর বিশেষ পছন্দ হয় না বলে চায়ের কাপ এগিয়ে দেওয়া আর দু-চারটে সৌজন্যমূলক কথা বলা ছাড়া বিশেষ মেশার চেষ্টা করেনি। তাই সে কী করে জানবে সুব্রত কীরকম কথা বলে।

কাবেরীকে চুপ করে থাকতে দেখে অনিন্দিতা বলল, সে-কথা শুনলে না তোর জল খসে যাবে...

—জল খসে যাবে! কী জল!

—কী জল বুঝতে পারছ না, কচি খুকি আমার, এই জল...।

বলেই দু-পায়ের ফাঁকে শাড়ির ভাঁজ দেখাল অনিন্দিতা। দু-পাটি দাঁত বের করে হো-হো করে হেসে উঠল।

কাবেরী বেশ রাগ দেখিয়ে বলল, তোর মুখে কি কিছুই আটকায় না।

অনিন্দিতা ভেংচে বলল, আটকায় না! সত্যি কথা বলতে গেলে আটকাবে কেন!

—তা এতটা সত্যি তুই জানলি কী করে? সুব্রত যখন আমাদের বাড়িতে আসে তখন তো তুই ওর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলিস না...

কাবেরীর মনে পড়ছে তাদের বাড়ির কবিতাপাঠের আসরে কি ফার্স্ট জানুয়ারির সন্ধ্যার জমায়েতে অনিন্দিতা সপরিবারে যখন এসেছে সুব্রতও এসেছে, সুব্রতর উপস্থিতি সম্পর্কে তার কাছে অনিন্দিতা মৃদু আপত্তিও জানিয়েছে। ওর বক্তব্য ব্যাচেলার লোক ফ্যামিলি পার্সেনদের জমায়েতে কেন? কাবেরীও উলটো রাগ করেছে। বলেছে, ব্যাচেলাররা কি ম্যানইটার নাকি ফ্যামিলি পার্সেনদের জমায়েতে তাকে নেমন্তন্ন করা যাবে না!

অনিন্দিতাও পালটা জবাব দিয়েছে, ওরা ম্যানইটার হলে তো তবু ভালো ছিল, ওরা তো ওম্যানইটার, যখন একটা বিপদে পড়বি তখন বুঝবি।

এখন অবশ্য মনে হচ্ছে কথাগুলো অনিন্দিতা তেমন ভুল কিছু বলেনি। কিন্তু আসল কথাটা তা নয়, এত উৎকণ্ঠা এত রাগের মধ্যেও একটা তীব্র কৌতূহলও উঠে আসছে ভিতরে। যে মানুষটার সম্পর্কে ওর মনে এতটা বিদ্বেষ রয়েছে তার সম্পর্কে ও এতটা

জানল কী করে। তাই প্রশ্ন করে বসেছে।

অনিন্দিতা বলল, তোকে তো সেই কথাটা বলা হয়নি। বলা হয়নি মানে কি বলত, আমি ইচ্ছে করেই বলিনি। লোকটা তোদের কাছে খারাপ হয়ে যাক আমি চাইনি। তোদের বাড়িতে ওকে অনেকবার দেখেছি, তোর হ্যাজব্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো, তা ছাড়া লোকটার তো জীবনে কিছু নেই, এর ওর আড্ডায় নিজেকে গুলে রেখে নিজেকে সচল রাখা—কি তাই তো।

ঘাড় নাড়ল কাবেরী।

অনিন্দিতা বলল, তোর দু-হাজার তিনের কথা মনে আছে।

—হ্যাঁ। কাবেরী ফের ঘাড় নাড়ে।

—যেবার শুভেন্দুর পা ভাঙল, বিছানায় তিনমাস শোয়া।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভিতরে-ভিতরে অধৈর্য হয়ে উঠছে কাবেরী। আসল কথাটায় আয় না বাবা।

অনিন্দিতা বলল, তখন তো তোদের বাড়িতে সব জমায়েত বন্ধ। একদিন পদ্মপুকুর থেকে ফিরছি, সুদেষ্ণাদের বাড়ি থেকে, আমার সেই সেজবোনের জা, তুই তো চিনিস...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—তা মিনিবাসের সিটে বসেছি, বসার সময় খেয়ালও করিনি পাশেই বসে পড়েছি। আমি কোনও কথা বলছি না আর ও তো জানলা দিয়ে বাইরেটা হাঁ করে দেখছে। দেখে কি মনে হচ্ছিল বলত এই যেন প্রথম কলকাতায় এসেছে, কলকাতা দেখছে। কথা যেন শেষ করতে পারল না অনিন্দিতা, খিলখিল করে হেসে উঠল।

কাবেরী ভিতরের রাগটা প্রকাশ না করে পারল না, আসল কথাটা বলবি না এই সব হাবিজাবি বকে যাবি!

অনিন্দিতা এবার বেশ সিরিয়াস। বলল, দেখ ওরকম তাড়াতাড়ি হ্যাপাজার্ডলি আমি কিছু বলতে পারি না, তোর যদি সময় না থাকে তবে আরেকদিন নয় এই নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

কাবেরী ভিতরে একটু থতমত খেয়ে গেল। অনিন্দিতার সঙ্গে তার কম ঘনিষ্ঠতা! বিয়ের পরে বান্ধবী বলতে তো ওই। লেডিজ ক্লাবের মাধ্যমে অনেকের সঙ্গে পরিচিতি আছে। কিন্তু সেটাকে পরিচিতি বলাই ভালো। বন্ধুত্ব বলতে তো অনিন্দিতাই। উৎসব-অনুষ্ঠানেই কী ওর সঙ্গে শুধু দেখা হয়েছে? দেখা হওয়াই বা কেন, দেখা না হয়েও তো পরস্পর পরস্পরের কত কাছে চলে গেছে। ফোনে-ফোনে কত কথা হয়েছে। ওর একান্ত বিপদেও তো কাবেরী বুদ্ধি দিয়ে, সময় দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। চন্দ্রাণী নামে সেই মেয়েটাকে বোঝানোর জন্যে বাঁশদ্রোণীতে অনিন্দিতার সঙ্গে কম গেছে কাবেরী! চন্দ্রানীর প্রেমে পড়েছিল অনিন্দিতার হ্যাজব্যান্ড অলকেশ। তারটা আবার শুভেন্দুর মতো নয়। শুভেন্দুর যেমন তপতী ভট্টাচার্যকে দেখেই সুখ, যতক্ষণ চোখের সামনে আছে আর কিছু জানে না, অলকেশের তেমন শুয়েই সুখ, চন্দ্রানী ওর চোখের সামনে এলে একটা আরামদায়ক সুসজ্জিত বিছানা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। কাবেরী অনিন্দিতার মুখে শুনেছে এক দূর সম্পর্কের পিসিমার শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল অলকেশ। সঙ্গে ছিল সেই পিসিমার ছেলে। মানে

অলকেশের পিসতুতো দাদা। তাও কীভাবে কে জানে সেই বাড়ির এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে বাজে অবস্থায় ধরা পড়ে যায় অলকেশ। ঘটনাটা শুনে কাবেরী অবাক হয়েছে। শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করতে গিয়ে কি এই ইচ্ছে জাগে! পরক্ষণেই মনে হয়েছিল জাগে হয়তো। আগ্নেয়গিরি তো সবসময় জেগে থাকে। কাবেরীর মনে হয়েছিল অলকেশের ঠিক দোষ নেই। কেউ চায়ে তিন চামচ চিনি খায়, কেউ এক চামচ, কেউ আবার খায় না। ওটাও তো এই শরীরেরই ব্যাপার।

চন্দ্রানীর ব্যাপারে অনিন্দিতা যখন উদ্বেগে ডুবে আছে তখন ওকে এভাবেই বোঝাবে ভেবেছিল কাবেরী। আর বলতে গিয়ে বুঝেছিল বোঝানোর কিছু নেই, অনিন্দিতা বুঝেই রয়েছে। অনিন্দিতা বলেছিল তা না তো কি এখন তো আর চন্দ্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছে না, নিজে থেকেই ট্রান্সফার নিয়ে চলে যেতে চাইছে।

কাবেরী অবাক হয়ে বলেছিল ট্রান্সফার নেওয়ার কী আছে আস্তে-আস্তে সরে এলেই হল। অনিন্দিতা মাথা নিচু করে নিয়েছিল, তা হওয়ার নয় রে, কাউকে বলিস না। ঘরে কেউ ছিল না তবু অনিন্দিতার স্বর ফিসফিসে হয়ে ওঠে। বলেছিল, চন্দ্রাণী প্রেগন্যান্ট, ওকে বিয়ে করার জন্যে চাপ দিচ্ছে, বলছে দরকার হলে আইনের সাহায্য নেবে।

কাবেরী বুঝেছিল নদীতে ঘূর্ণি তৈরি হয়েছে আর সেই ঘূর্ণিতে পড়েছে অনিন্দিতা। আপাতত সমাধান বলতে অলকেশের বদলি নেওয়া। অনিন্দিতা সেই প্রসঙ্গে বলেছিল, ও বাইরে থাকলে

আমার অবস্থাটা কী হবে একবার ভেবে দেখেছিস। বাইরে যাই করে বেড়াক সংসারের কাজ তো কম করে না, মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসা, বাজার করা, তারপর ধর গ্যাস বুকিং, ফোনের বিল-ইলেকট্রিকের বিল দেওয়া, এগুলো তো সব আমার ঘাড়ে এসে পড়বে। এমনিতেই সংসারের কত কাজ।

কাবেরী বুঝতে পারছিল অনিন্দিতার সমস্যা। কে কী ভাবে জানে না, কাবেরী কিন্তু জানে অনিন্দিতা যা বলছে মেয়েদের কাছে সত্যি তা খুব সমস্যার। তাই উদ্যোগটা না নিয়ে পারেনি কাবেরী। বলেছিল, চল না আমরা মেয়েটাকে বোঝাই যে অলকেশ ওকে ভালোবাসে না, যেটা ঘটেছে সেটা অলকেশের স্বভাবদোষ ছাড়া আর কিছু নয়। উত্তরে অনিন্দিতা শুধু একরাশ হতাশা নিয়ে ফ্যাকফ্যাকে চোখে তাকিয়ে থেকেছিল কাবেরীর দিকে। কাবেরী বলেছিল দেখিস ঠিক একটা সুরাহা হবে, সেরকম হলে আমরাই উদ্যোগ নিয়ে চন্দ্রাণীর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলব।

কাবেরীর উৎসাহতেই অনিন্দিতা দৌড়ঝাঁপ শুরু করে আর তার বলে দেওয়া পথেই সমাধান হয়েছিল, তখন তো কাবেরী ব্যাপারটাতে গা নাই লাগাতে পারত। কি আছে অত, কলেজের বান্ধবী, বিয়ের পরেও যোগাযোগ আছে, উৎসবে অনুষ্ঠানে দেখা হয় হাসি-ঠাট্টা ইয়ার্কি হয় ঠিকই আছে। তার সমস্যার মধ্যে নিজে জড়াতে যাবে কেন? আজকাল তো প্রায় সকলেই এটাকে বোকা-বোকা আচরণ মনে করে। তবুও তো গা লাগিয়েছিল কাবেরী। আর আজ অনিন্দিতা তার চরম সঙ্কটের মুহূর্তে এরকম মজা নিচ্ছে! এই মুহূর্তে তার একমাত্র স্বপ্নটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে

যাচ্ছে আর সেটা রেলিশ করছে! এর নাম বান্ধবী। কিছুতেই আসল কথাটা না বলে সেটাকে ফেনানো! কোনও গোপন রাগ মিটিয়ে নিচ্ছে না তো অনিন্দিতা। তাদের বাড়িতে অনিন্দিতাকে যখন দেখেছে তখন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝেছে শুভেন্দু, রিমি, হাজার স্কোয়্যারফুটের সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট নিয়ে তার ভরন্ত সংসার অনিন্দিতার ভিতরে শুধু দীর্ঘশ্বাসের জন্ম দেয়। কিন্তু সেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার সময় কি এটা!

অনিন্দিতাকে তো বলেছে রিমি কতটা জায়গা জুড়ে আছে তার ভিতরে। যখন রিমি স্কুলে পড়ে তখন তো কাবেরীর কালীঘাটের বাড়ি এরকম ফ্ল্যাটবাড়ি ছিল না। মাঝখানে উঠোন। চারদিকে ঘর। শুভেন্দুর খুড়তুত জ্যাঠতুত ভাইদের সংসার নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার। চেতলার কাদম্বরী বালিকা বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে রিমিকে যেবার ক্যালকাটা গার্লসে ভরতি করিয়েছিল কত সব সমালোচনা শুনতে হয়েছে শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে। ওসব ট্যাঁশ পাড়ায় বাড়ির মেয়েদের কেউ পাঠায় নাকি, যত নামীই স্কুল হোক না বাবা, ওই পাড়াতে যখন, তখন যাই শিক্ষা পাক না কেন আসল শিক্ষাটা ও-ই পাবে। ও-ই বলতে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত। শুধু সমালোচনা করাই নয়, সমালোচনা করার কোনও সময় জ্ঞান থাকত না। তখন তো মেট্রো নেই, বাসে বা ট্যাক্সিতে, তেতে পুড়ে মেয়েকে নিয়ে এতটা পথ ফিরল, বাড়িতে ঢুকতে-না-ঢুকতেই কানের কাছে শুরু হয়ে গেল ওই কথাগুলো। একদিন, দু-দিন নয়, বছরের-পর-বছর সহ্য করে এসেছে কথাগুলো। দাঁতে দাঁত চেপে। মনে-মনে বলেছে চেঁচিয়ে উত্তর দিয়ে কোনও লাভ

নেই, কাজে করে দেখিয়ে দিতে হবে। মেয়েকে ঝকঝকে তৈরি করে ওরকমই ঝকঝকে একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিয়ের পরেবদিন যখন মেয়ে-জামাইকে গাড়িতে তুলে দেব, তখন তোমাদের মুখের দিকে তাকাব। একবার শুনব তখন কী বলো।

তার এই স্বপ্নের কথা তো অনিন্দিতা জানে। তাহলে! এভাবে ঘটনাটা নিয়ে খেলছে কেন! তোর যদি সময় না থাকে তবে পরে আলোচনা করা যাবে বলে কাবেরীর সামনে আর বসে থাকেনি অনিন্দিতা। লেবু-রস মিশ্রিত মধুর সরবত শেষ হয়ে যাওয়ায় গ্লাসটা রান্নাঘরে রাখার অজুহাতে উঠে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যে অজুহাত ভালোমতোই বুঝতে পারছে কাবেরী। না হলে এতক্ষণ কী করছে! মানে তুমি সুব্রতর সম্পর্কে আসল কথাটা শোনার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠছ, দাঁড়াও তোমাকে আরও অধৈর্য করে ছাড়ব। বাধ্য হয়েই কাবেরী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

রান্নাঘবের সামনে এসে বলল, তোর ব্যাপারটা কী বলত? তুই কি জাস্ট মজা মারার জন্যে কাল দুপুরে ফোন করে খবরটা দিয়েছিলিস!

রান্নাঘরের সিঙ্কের দিক থেকে মুখ তুলে অনিন্দিতা মুখেচোখে অবাক হওয়ার ভাব ফুটিয়ে বলল, মজা মারার জন্যে ফোন করব কেন! কী বলছিস কি!

—গ্লাস রাখতে এত সময় লাগে!

—আরে তা নয়, গ্লাস রাখতে এসে দেখি সিঙ্কের ঝাঁজরিটায় কীসব আটকে রয়েছে, জল যেতে চাইছে না। যে কাঠিটা দিয়ে খোঁচাচ্ছিল সেটা তুলে দেখাল অনিন্দিতা।

কাবেরী বলল, ওটা পরিষ্কার কর'র সময় বুঝি এখন হল?

অনিন্দিতা হাতের কাঠিটা ফেলে দিয়ে নাইটিতে হাত মুছতে-মুছতে বলল, চল চল বসার ঘরের সোফায় বসে বলি।

কাবেরী একটুও নড়ল না। বলল, আর বসে কাজ নেই, রিমি ঘুমচ্ছে দেখে ল্যাচ টেনে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। ঘুম ভেঙে কাউকে দেখতে না পেলে ভয় পেয়ে যাবে, সুব্রত সম্পর্কে যা জানিস খোলশা করে তাড়াতাড়ি বল।

কাবেরী অনুরোধটা কাকে করল কে জানে, অনিন্দিতা শুরু করল ওর সেই মিনিবাসে সুব্রতর পাশে বসে পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে। বলল, যতক্ষণ হাঁ হয়ে বাইরেটা দেখছিল ততক্ষণ ভালোই ছিলাম, ভাবছিলাম যাক বাবা টের পায়নি পাশেই বসে আছি। ও মা পাশ ফিরতেই কথা শুরু করে দিল! আপনার নাম তো অনিন্দিতা সরকার, আপনার বাড়ি তো ডোভার লেনে, আপনার হ্যাজব্যান্ড এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে আছে না? আমি তো অবাক বুঝলি, তোদের বাড়িতে তো কতলোকই আসে, অল্পস্বল্প আলাপ অনেকের সঙ্গেই হয়েছে, কিন্তু এত কথা আমি কাউকেই বলিনি। ভেবেছিলাম তুই বা শুভেন্দু হয়তো বলেছিস, পরে জানলাম শম্পার কাছ থেকে জেনেছে।

—শম্পার কাছ থেকে! তা তোর মেয়েকে ও চিনল কি করে?

—তুই তো জানিস আমার মতোই আমার মেয়ে, ওর তো এসব কবিতা-টবিতা ভালোলাগে না, তোদের বাড়িতে ওই

অকেশানে গেলে নয় রিমির ঘরে থাকে না হলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুব্রত নাকি লক্ষ করে ব্যালকনিতে শম্পা একা-একা দাঁড়িয়ে আছে। গিয়ে বলেছিল তুমি খুব একা, না? তারপর নাকি ভাব হয়ে যায়। শম্পাই সব বলে। আমি শুনতে-শুনতে অবাক হচ্ছিলাম একটা কথা ভেবে—আমার উপস্থিতিতেই শম্পার সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেল আর আমি জানতে পারলাম না! একেবারে সাবমেরিন মাল বুঝেছিস। আর একটা ব্যাপারেও অবাক হয়েছিলাম যখন বুঝছিলাম মিনিবাসের ঝাকুনিতে ওর কনুইটা আমার পেটে এসে লাগছে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা দেখছে, ও কিন্তু একটুও অস্বস্তি বোধ করছে না। স্বাভাবিক চোখ-মুখ নিয়ে স্বাভাবিক স্বরেই কথা বলে চলেছে। মানে একেবারে পাকা খেলুড়ে। আমায় বলেছিল কবিতা লেখেন? আমি হেসে বলেছিলাম ওসবের ধারে কাছে আমি নেই। আমিও জিগ্যেস করলাম আপনি কবিতা লেখেন? মাথা নেড়ে বলল না। আমি বলেছিলাম, কেন, আমার যতদূর মনে পড়ে কাবেরীদের বাড়িতে আপনাকে আমি কবিতাপাঠের আসরেই বেশি দেখেছি। আপনার তো কবিতা লেখাটাই স্বাভাবিক, লেখেন না কেন? হেসে কী বলল জানিস, আমি তো নিজেই কবিতা আমি আবার কবিতা লিখতে যাব কেন। এ অবধি হলেও নয় হতো, আমার সঙ্গে গড়িয়াহাটেই বাস থেকে নামল। হাঁটতে-হাঁটতে কী বলল বলত, আমায় ধরে দেখুন দেখবেন কোনও মানুষের শরীর পাচ্ছেন না একটা কবিতা পাচ্ছেন...। বলতে-বলতে হেসে ফেলল অনিন্দিতা।

কাবেরীর মনে পড়ল এই অনিন্দিতাই মুহূর্ত কয়েক আগে

বলছিল রাস্তা একটাই, সুব্রতকে আচ্ছাসে ধোলাই দেওয়া। আবার সেই সুব্রতর ঘটনা বলতে-বলতে এখন কৌতুকে ভেসে যাচ্ছে অনিন্দিতার চোখমুখ। কোনটা আসল কোনটা মিথ্যে কিছুই বুঝতে পারছে না কাবেরী। কিন্তু যাই বলুক না কেন অনিন্দিতা, আসল কথাটা হচ্ছে কথার যাদু। সুব্রতর কথার যাদু। নিছক কথার যাদুতে বধ হয়ে যাবে রিমি! রিমি মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু না পেয়ে বড় হওয়া মেয়ে তো নয় যে কিছু সুন্দর-সুন্দর কথায় মোহিত হয়ে একটা হাফ হাবরাকে মন দিয়ে বসবে।

কাবেরীকে চুপ করে থাকতে দেখে অনিন্দিতা বলল, হাঁটতে-হাঁটতে আরও সব মজার কথা বলছিল সেদিন সুব্রত। ফুটপাতের ধারে গাছের গায় একটা লতা বেড়ে উঠেছে, সেটাকে দেখিয়ে বলল, দেখেছেন লতাটা কীরকম আদর করছে গাছটাকে, ওটা কিন্তু গাছ আর লতা নয়, মানুষ-মানুষী, বলেই অদ্ভুতভাবে হেসে উঠেছিল। জানিস, তারপর বলল এই যে আমাকে মানুষের মতো দেখতে আসলে কিন্তু আমি কবিতা, আবার ওই গাছ ওই লতা গাছের মতো লতার মতো দেখতে হলে কী হবে আসলে ওরা মানুষ, মানুষ না হলে পরস্পর পরস্পরকে ওরকম আদর করতে পারে কখনও...। এবারেও কথার শেষে খুব হাসল অনিন্দিতা।

কাবেরী বেশ রেগে গেল। বলল, তুই হাসছিস! এগুলোকে তুই সুব্রতর কথা বলার যাদু বলে বোঝাতে চাইছিস! এগুলো তো আসলে অসভ্যতা, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বিছানায় শোওয়ানোর টোপ...

—তাইতো। কিন্তু ডিজাইনটা ঠিক কী করে সেটা বোঝানোর জন্যে তোকে ডিটেলসে বললাম।

কাবেরীর বুকের ভিতরে মেঘ ডাকছে এখন। তাহলে ওল্ড হ্যাগার্ডটা কী যৌনতা দিয়ে জয় করে নিল রিমিকে! শুনেছে কিছু-কিছু পুরুষ থাকে যাদের বয়স যত বাড়ে বিছানার জোর নাকি ততই বাড়ে। সুব্রত কী তাহলে সেই ধরনের পুরুষ? এতক্ষণ তো শুধু রিমির সুব্রতর ওপরে প্রেমে আচ্ছন্ন হওয়ার ব্যাপার নিয়ে ভয় পাচ্ছিল এখন তো একটা অন্য ভয় পাচ্ছে, যদি সেরকম কোনও রিলেশান তৈরি হয় তবে তো একেবারে সর্বনাশ! বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে অনিন্দিতার দিকে তাকাল কাবেরী।

অনিন্দিতা হেসে বলল, তবে তুই যা ভয় পাচ্ছিস তা নয়, ব্যাটার সব মুখেই, সেই এফিসিয়েনসি নেই।

—তুই কি করে জানলি?

—এতদিন সংসার করা হয়ে গেল আর কোন পুরুষ মানুষটা কোনওরকম সেটা বুঝব না!

একথার কোনও মানে খুঁজে পেল না কাবেরী। সংসারে তো অনিন্দিতা একটা পুরুষ ঘেঁটেছে। তার মাধ্যমে কোন পুরুষটা কীরকম সেটা বুঝবে কী করে! পরমুহূর্তে অবশ্য মনে হল অলকেশের মতো আগ্নেয়গিরির সঙ্গে যে এতগুলো বছর কাটাল সে নিশ্চয়ই তাব থেকে পুরুষমানুষ একটু বেশিই চেনে। কিন্তু চিনুক আর নাই চিনুক তার সমস্যার সমাধান হবে কী করে! কাবেরী প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, কী করব সেটাই বল।

—কী আবার করবি, তুই যখন ওকে সামনে ডেকে ধমকাতে

চাইছিস না, সেটা থাক তাহলে। তুই একটা অন্যপথে যা। তোর পরিচিত লোকেজনেরা অনেকেই সুব্রতকে চেনে, তাদের কথাটা জানিয়ে দে যে, বাইরে একটা কাব্যিক মোড়ক থাকলেও আসলে লোকটা ভালগার, একেবারে নোংরা লোক, তারপর দেখি ও সকলের সামনে মুখ দেখায় কী করে!

—তার থেকে রিমির একটা বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে হয় না?

—সেভাবেই তো আমি আমার শম্পাকে বাঁচালাম। কিন্তু তাতে কী সমস্যাটা সরে গেল, ও তো আবার রিমিকে ধরেছে, রিমি গেলে আরেকজনকে ধরবে, ও তো একটা সোশাল ক্রাইম করে চলেছে এটা তো বন্ধ হওয়া দরকার।

কাবেরী কিছু বলতে পারল না। অনিন্দিতার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু একটা জিনিস আন্দাজ করতে পারছে না এই প্রচারটা করে কতটা ফল পাবে? মেয়ের বাবা কনভিনসড্ যে সুব্রত ভালো লোক। মেয়ে তার হাত থেকে আইসক্রিম খাচ্ছে যখন, তখন ভাবার দরকার পড়ে না তার কাছে সুব্রত কতটা ভালো। কবিতাপাঠের আসর থেকে অন্যান্য অনুষ্ঠানের জমায়েতে সকলেই ওর সঙ্গে যে-ভাবে কথা বলে তাতে ওর প্রতি সকলের যে একটা প্রচ্ছন্ন পছন্দ আছে, সেটা বলে দিতে হয় না। তাহলে? অনিন্দিতার কথাগুলো যদি সত্যিও হয় তাহলেও তো বলতে গিয়ে সে-ই খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে? বেশ অসহায় স্বরে কাবেরী বলে উঠল, অন্যকোনও ভাবে ব্যাপারটা সলভ করা যায় না?

—অন্য ভাবে! মুখে বিস্ময় বিরক্তি মেখে অনিন্দিতা বলল।

তারপর হেসে উঠে বলল, তাহলে একটা কাজ কব মেয়ের জায়গায় তুই প্রেম শুরু করে দে সুব্রতর সঙ্গে।

—মানে!

—মানে আবার কী, একটা প্রেম সরাতে গেলে তো সেই জায়গায় আরেকটা প্রেমকে ঢুকে পড়তে হবে, না হলে আগেরটা সরবে কী করে?

—অনি। ধমকে উঠল কাবেরী। একেই সে মরছে নিজের জ্বালায় আর অনিন্দিতা তার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে রসিকতার রসদ! বিচিত্র!

অনিন্দিতা ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলল, কী করব বল, তুই বাঁ-দিকেও হাঁটবি না ডানদিকেও হাঁটবি না. তোর প্রবলেম কে সলভ করবে বল!

কাবেরী বুঝতে পারছে এখানে বসে থেকে কোনও লাভ নেই। শুভেন্দু তাকে কোনও সমাধান দিতে পারেনি, সমাধান দেওয়া তো দূরের কথা খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে শোনেইনি, ভেবেছিল অনিন্দিতার কাছ থেকে একটা যুতসই সমাধান পাওয়া যাবে, কিন্তু এখন বুঝতে পাবছে তারও কোনও সম্ভাবনা নেই। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কাবেরী। হ্যান্ডব্যাগটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিতে-নিতে বলল, তোকে আমার একটাই রিকোয়েস্ট অনি এটা নিয়ে তুই কারুর সঙ্গে আলোচনা করিস না।

অনিন্দিতার দু-চোখের আলো যেন দপ করে নিভে গেল। উদাস স্বরে বলল, তুই যখন বলছিস তখন আমি কাউকে বলব না, কিন্তু ব্যাপারটা সকলকে জানালেই ভালো ছিল।

—ঠিক আছে সেটা তো পালিয়ে যাচ্ছে না, আমায় আরেকটু ভাবতে দে।

অনিন্দিতা নিরুত্তর।

কাবেরী বলল, আজ আসি, ফোন করব, ঠিক আছে।

অনিন্দিতা ফ্ল্যাটের সদরদরজা অবধি এগিয়ে এল, দবজা বন্ধ করবে এবার। বলল, একটা কথা, তুই কিন্তু রিমিকে বলিস না আমার কাছ থেকে এসব জেনেছিস।

—ঠিক আছে, তোর এ নিয়ে চিন্তার দরকার নেই।

কাবেরী সিঁড়ি ধবে নেমে আসছে, এমনিই পেছনে তাকিয়েছিল। লক্ষ করল ফ্ল্যাটের দরজা এখনও বন্ধ হয়নি। সরু ফাঁকের মধ্যে দিয়ে অনিন্দিতা তাকে দেখাব চেষ্টা করছে। মুখ ঘুরিয়ে নিল কাবেরী। সত্যি সকলের কাছে ভালো থাকার কী প্রবল আকাঙ্খা।

বাস ছুটছে হু-হু করে। পৌষ মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। ছুটন্ত বাসের খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া হাওয়া বেশ অস্বস্তি দিচ্ছে। শুভেন্দু অফিসের জন্যে বেরিযে যাওয়ার পরে রিমি ঘুমচ্ছে দেখে মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করেনি। তাড়াহুড়ো করে বেরোনোর জন্যে চাদর নিতে ভুলে গেছে কাবেরী। আঁচলটা টেনে নিয়ে গলা ঢাকার চেষ্টা করল। তবুও শীত-শীত ভাবটা কমছে না। কাবেরী বুঝতে পারছে এই শীত-শীত ভাব ঠান্ডা হাওয়ার জন্যে নয়। তার মন যে কাঁপছে অনিন্দিতার ওই বিশেষ কথাটা শোনার পর থেকেই। 'মেয়ের জায়গায় তুই প্রেম করা শুরু করে দে'—ব্যাপারটা যদি সত্যি-সত্যি ঘটায় তাহলে কেমন হয়? মা আর মেয়ের একই

প্রেমিক? তাতে কী হয়েছে। আজকাল তো এরকম ঘটছে। তবু তো তার কাছে একটা যুক্তি আছে। মেয়ের প্রেম ছাড়ানোর জন্যে নিজে প্রেম করছে।

কাবেরী শুনতে পেল কন্ডাক্টার 'কালীঘাট কালীঘাট' করে চেঁচাচ্ছে। সম্বিৎ ফিরল যেন। সিট ছেড়ে দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে এল গেটের সামনে। নামার সময় শুনতে পেল কন্ডাক্টার বলছে এরা যে কোথায় থাকে কে জানে, কখন থেকে চ্যাচাচ্ছি কালীঘাট কালীঘাট! যতসব..।

ফুটপাত ধরে হাঁটছে এখন কাবেরী। কানে বাজছে কন্ডাক্টারেব কথা। সত্যিই কোন জগতে যেন ছিল সে। কলেজ জীবনে প্রেম করার কত আহ্বান এসেছে, কোনওদিনই সাড়া দেয়নি, আর আজ মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে গেছে সে ভাবছে প্রেম করার কথা! সত্যি জীবন কি বিচিত্র বস্তু। কাল দুপুরে আসা অনিন্দিতার একটা ফোন কীরকম ওলোট-পালোট করে দিল সবকিছু।

॥ পাঁচ ॥

মোবাইল স্ক্রিনে সজলের নম্বরটা দেখতে পেয়ে রিমি কিছুক্ষণ বিষাদের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। তারপর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল ছিল না। এখনও যে ঘুমটা ভাঙত তা নয়, রাতের অর্ধেকটা ঘুম না হওয়া, সকালে দুম করে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরে সজলের নম্বরটা মোবাইলে দেখতে পাওয়া, সব মিলিয়ে মাথার ভিতরে যে ঘন কুয়াশা তৈরি হয়েছে তার জেরে সারাটা দুপুরই

বোধহয় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিত রিমি। মায়ের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেছে রিমির। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রয়েছে মায়ের দিকে। কাবেরী বলল, দেড়টা বাজে এখনও শুয়ে আছিস! কী ব্যাপার? শরীর খারাপ?

কোনও উত্তর দিল না রিমি। সে নয় ঘুমিয়েই ছিল। মা তো আর ঘুমিয়ে ছিল না। ডাকতে কী অসুবিধা ছিল। বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল রিমি। কাবেরী বলল, তোর মোবাইলটা বাজছিল ঘুমচ্ছিলিস বলে আর ডাকিনি।

—দেখেছ কার নম্বর?

—হ্যাঁ, ঠিক চিনতে পারলাম না।

রিমি দেখল রান্নাঘরে গ্যাস জ্বেলে মা দুপুরের খাওয়ার গরম করছে। চোখ সরিয়ে নিয়ে বিছানার সামনে এসে মোবাইলটা তুলে নিয়ে বোতাম টিপল। মিস কলের লিস্টে দেখতে পেল সুব্রতর নম্বর। মা বলল নম্বরটা চেনে না। মা কি সত্যি চেনে না! রান্নাঘরের সামনে এসে বলল, এটা তো সুব্রতকাকুর নম্বর...

—ও।

—ও মানে! তুমি নম্বরটা চেনো না!

—আমি চিনব কী করে, তোর বাবার বন্ধু তোর বাবাই জানে। তোর বাবার বন্ধুর মোবাইল নম্বর জেনে আমি কী করব বল?

কথার শেষে মায়ের চোখে কী যেন আটকে রইল। মা কী বোঝাতে চাইছে? এই নম্বরটা জেনে সে গর্হিত কাজ করেছে? মনে-মনে হাসল রিমি। মা যাই ভাবুক এই নম্বরটাই এখন তার বেঁচে থাকার, নতুন করে বেঁচে ওঠার নম্বর। এক্ষুনি এই নম্বরে একটা

রিং করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু করবে না। তার আগে আরেকটা নম্বরে ফোন করাটা বিশেষ জরুরি। সজলের কাছ থেকে জানতে হবে ওর ভিতরে তার জন্যে আর কী পড়ে আছে যার জন্যে এতদিন পরে মাঝরাতে ফোন? আর নম্বরটাই বা পেল কী করে!

বেসিনের কল খুলে আঁজলা করে মুখে জল ছেটাচ্ছে রিমি। শুনতে পেল মা নিজের মনে বক-বক করে চলেছে, বাজারে যাওয়ার সময় বারবার কবে বললাম কাঁচালঙ্কা এনো, ঠিক ভুলে গেছে! কাকে নিয়ে যে সংসার করি আমি...

আজ রিমি বাজারে যাইনি। অকাতরে ঘুমচ্ছিল। তাই অনেকদিন পরে বাবা বাজারে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে বলে সম্ভবত গুছিয়ে করতে পারেনি। তা নিযে এত উষ্মা প্রকাশ করার কি আছে। একদিন লঙ্কা না থাকলে খাওয়া হবে না? মা যেন দিনদিন কীরকম হয়ে যাচ্ছে। এত খিটখিটে তো মা ছিল না। অন্তত পুণা থেকে চলে আসাব পরে যা দেখছে এরকম অন্তত ছিল না মা। কখনও গলার চেনের ‘এস’ টা মানে আংটাটা বাবা সোনার দোকান থেকে ঠিক কবে নিয়ে এল না কেন তাই নিয়ে ঝগড়া করছে, কখনও গোড়ালি ফাটার ক্রিম বাবা নিয়ে আসতে ভুলে গেল কেন সেই নিয়ে বকাঝকা—এরকম কত যে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মা আজকাল বাবার পেছনে পড়ে থাকে বলে শেষ করতে পারবে না রিমি। নিজে তো লেডিজ ক্লাবের ব্যাপারে, অন্য কাজে কতবার বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছে। নিজেই তো মনে করে নিয়ে আসতে পারে। নাকি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করবেই বলে নিয়ে আসে না। নাকি এসব কিছুই নয়, মা শুধু বুঝিয়ে দিতে চায় মা’র

ওপরে বাবার কোনও নজরই নেই। আচ্ছা এই ছোটখাট নজর রাখার নামই কী প্রেম? ভালোবাসা? হৃদয়ে হৃদয় মিশে যাওয়া? সে প্রেম করছে অনিন্দিতামাসির কাছ থেকে জেনে গেছে আর তাই খেপে উঠেছে ভিতরে-ভিতরে? বাবার প্রতি রাগটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে তাই? তার মানে মাও তো এখনও প্রেম চায়। সাতাশ-আঠাশ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে ফেলল যে তারও মনে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা? প্রেম এমনই বস্তু? অথচ সে প্রেমের জন্যে সময ব্যয় করছে বলে সেই মাযেরই চোখেব ওপরে ভেসে আছে ইউ আর ওয়েস্টিং ইওর ভ্যালুএবেল টাইমস্! আজকাল মায়ের এই আচরণে রাগ অভিমান কিছুই হয না রিমির। মনের মধ্যে শুধু বিস্ময় জাগে। সে শুধু অবাকই হয়।

ডাইনিং টেবিলে কাবেরী দুজনের জন্যে খাওয়ার বেড়েছে। কাঁচালঙ্কা নেই বলে নিজের থালায় স্বাভাবিকেব থেকে প্রায অর্ধেক ভাত নিয়েছে। ভাতের পাতে কাঁচালঙ্কা না থাকলে কাবেরীর মুখে ভাত ওঠে না। মনে-মনে হাসল রিমি, অত লঙ্কা খায় বলেই বোধহয় এত রাগ। আরেকটা থালায় যে ভাত বেড়েছে সেটা নিশ্চয়ই তার জন্যে। ওটার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে রিমি বলল, আমি এখন বেরোব...

—বেরোবি মানে! এই ভর দুপুর পর্যন্ত পড়ে-পড়ে ঘুমলি, স্নান করিসনি, এখন না খেয়ে বেরোবি মানে!

—ঘুমিয়ে ছিলাম বলেই তো দেরি হয়ে গেল, এখন না বেরোলে হবে না। মুখের ওপরে বিরক্তি ব্যস্ততা ফুটিয়ে তুলল রিমি।

—কী রাজকার্যে বেরোবে তুমি যার জন্যে খেতে পর্যন্ত

পারবে না। কাবেরীর গলা একটু-একটু করে চড়ছে।

রিমি যে আসল কথাটা একবারের জন্যেও বলতে পারছে না, খেতে কেন মা'র সামনে এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুব্রতকে জানাতে হবে অনিন্দিতামাসির কাছ থেকে মা খবরটা পেয়েছে। দ্বিতীয় কাজটা হল সজলকে ফোন করা। সেই ফোনটা ছোট হবে না রিমি জানে। তাই সেটা বাড়িতে বসে করা যাবে না। বেরোতেই হবে তাকে। না হলে মাকে একটা উত্তর দেওযা যেতই। তাতে তাব সময নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না। কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল রিমি।

নীল জিনসের প্যান্ট, হলুদ রঙের ডেনিম হাফহাতা শার্ট চাপিয়ে বেরিয়ে এল রিমি। তাই দেখে কাবেরীর ব্লাডপ্রেসার ধপ করে কিছুটা বেড়ে গেল। ভুরু ধনুক হয়ে গেল। বলল, কোনও কথার উত্তর দিচ্ছ না বেরিয়ে যাচ্ছ, কী ব্যাপার আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না!

—আমি তো তোমায় বললাম অলরেডি আমার দেরি হয়ে গেছে, এখন না বেরোলে আমার কাজগুলো হবে না।

—কী কাজ এখন তুমি করবে বলত! কাজ! কাজ! কাজ দেখাচ্ছ! এখানে যেখানে-যেখানে তুমি যাচ্ছ সেখানে বাইশ হাজার টাকা কেউ দিচ্ছে? দেবে কী, সেই ক্যাপাসিটি আছে!

রিমি কোনও উত্তর দিচ্ছে না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মার দিকে।

কাবেরী বলল, তুমি পুণায় ফিরে যাও।

—পুণায়! কেন!

—কেন আবার তাতেই তোমার ভালো হবে।

—এতেই আমার ভালো! কেন চাকরিটা ছেড়ে সবে যখন কলকাতায় এলাম তখন তো তুমি বলেছিলে এটাই ভালো হয়েছে, সেই ছোটবেলা থেকে তুমি আমায় প্রতিটি মুহূর্তেই নজরে-নজরে রেখে এসেছ, এখনও রাখতে পারবে, বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তোমার দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে, একেবারে হানড্রেডে হানড্রেড...। হেসে উঠল রিমি। হাসি থামিয়ে বলল, সেসব কোথায় গেল! হাওযা! পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে গেল।

—কীভাবে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হয় সেটাও ভুলে গেছ!

এবার আর শুধু ভুরু ধনুক হওযা নয়, ঠোঁটও কাঁপল কাবেরীর।

রিমি আপাতত একটা সমাধানের জন্যে হালকা করে হাসল। আঁচ বাড়তে দিয়ে লাভ নেই। তাকে বেরোতেই হবে। সুব্রতব সঙ্গে দেখা করতেই হবে। কাল রাতে স্বপ্নে যে আঙুলগুলো তাকে চন্দনের বাটা মাখিয়ে দিচ্ছিল সারা মুখে সেই আঙুলগুলো সুব্রতর কিনা তাকে দেখতে যেতেই হবে। যতক্ষণ না পরীক্ষা করছে ততক্ষণ যেন শান্তি নেই। একটা কাঁটা খালি ফুটছে। এর সঙ্গে সজলকে ফোন করার ব্যাপারটা তো আছেই। ঘরের পরিমণ্ডল স্বাভাবিক করার জন্যে বলল, আচ্ছা আমি ভুল কিছু বললাম? এই কথাগুলো তো তুমিই বলেছ, বলনি?

কাবেরীও এবারে রাগ মুছে নিয়ে দক্ষ হাতে খেলাটাকে ধরল। স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল, ও কথাগুলো আমিই বলেছি এবং ভুল কিছু বলিনি এবং সেগুলো আমার ভেতর থেকে ডানা মেলে

উড়ে যাইনি, আর উড়ে যায়নি বলেই তোমাকে এখন বেরোতে বারণ করছি...

—মানে?

—তুমি কী জানো তোমার পিসিতে একটা ই-লেটার এসেছে পাঁচদিন আগে?

—ই-লেটার? কার?

—আগে বলো খবরটা কী তুমি জানো?

রিমি মাথা নাড়ল। সে জানে না।

—তাহলে তুমিই বলো তোমার ওপরে আমার নজর নেই?

রিমির ভিতরে মার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ভাব ছিল। কিন্তু এখন তার সঙ্গে একটা অন্য জিনিস এসে মিশছে। ফ্যালাসি করে যুক্তি দিয়ে অঙ্ক কষে মা তাকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে মা তাকে ভালোবাসে। এই ভাবে ভালোবাসা বোঝানো যায়? রিমি খুব রুক্ষ্ম স্বরে বলল, চিঠিটা কার সেটাই বলো না।

—বলছি, কিন্তু তার আগে তুমি খাবে, তারপর চিঠির উত্তর দেবে, তারপর যদি বেরোতে চাও বেরোবে।

—ঠিক আছে, এবার বলো।

—রোহিতের।

—রোহিতের মানে?

—রোহিত ভাটনগর।

এমন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যেও মনে-মনে না হেসে পারল না রিমি। মা প্রথমে কী সুন্দর বলল রোহিত। যেন মার কতদিনের পরিচিত। পারেও বটে। মাস তিন-চার আগেও এই

লোকটা মায়ের কাছে ‘মেয়েধরা’ ছিল, হিন্দি ছবির ভিলেনের মতো দেখতে নাকি, আর আজ প্রিয় হয়ে গেল!

কিন্তু মাকে যুতসই উত্তরটা দেওয়া হল না রিমির। মনটা খচখচ করে উঠেছিল অন্য ব্যাপারে। মানুষটা তাহলে তার পিছু ছাড়ল না এখনও। তার মানে উত্তর যদি দেয় তবে পিছু ছাড়ানোর ব্যাপারটা আরও পিছিয়ে যাবে। উত্তর দিক বা না দিক চিঠিতে কী লিখেছে একবার পড়ার দরকার আছে। এক স্ট্র্যাপের স্যাচেল টাইপের ব্যাগটাকে কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে ফের নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

কাবেরী বলল, আগে খেয়ে নে না...

—পরে পরে...

—ঠিক আছে।

মার ‘ঠিক আছেটা’ বোঝাল মা খুব আশ্বস্ত এই মুহূর্তে। কোথায় যেন নিশ্চিন্ত। আচ্ছা রোহিত ভাটনগরকে আপনার করে রোহিত বলা, রোহিতের চিঠি পড়তে যাচ্ছে বলে না খাওয়ার ওপরেও ছাড়, মার মন এতটা উৎফুল্ল কেন! আগে আপত্তি থাকলেও এখন মেনে নিয়েছে? মানে সুব্রতর ভয়। ও সরে গিয়ে যদি এ আসে তাহলেও ঠিক আছে এরকম ব্যাপার। হাসি পেল রিমির। তবে পি. সি.-র সামনে চেয়ার টেনে বসতে-বসতে একটা আনন্দও হল। তাহলে সুব্রত হারিয়ে দিল রোহিত ভাটনগরকে? দ্যাট ওল্ড হ্যাগার্ড? এ-বাড়িতে আড্ডায়, অনুষ্ঠানে যারা আসে তাদের সকলের ভাষায় লোকটা এই। সেই লোকটাই হারিয়ে দিল! জীবনের রেস এইরকমই। কে কখন কোথায় জিতে যায় কেউ জানে

না। তুমি লেডিজ-ক্লাব করো। কত চেনা-জানা। সুব্রত তো একা। যখন যার দরকার পড়ে ডাকে। কেউ নেই ওর। অথচ ওর ভয়েই তুমি তোমার অপছন্দের লোককেও পছন্দ করে ফেলছ। ওকে কেন ভালোলেগে গেছে জানো মা ও কিচ্ছু না হয়েও অনেককিছু। কিন্তু এভাবে বললে মা কী কিছুই বুঝবে? যে অঙ্ক কষে ভালোবাসা বোঝাতে চায় তাকে এসব কথা বলে কী হবে! তার থেকে রোহিতেব চিঠিটা পড়ে ফেললে অন্তত একটা কাজ হবে।

মাউস ঘুরিয়ে নিজের ওয়েবসাইটে চলে এল রিমি। চিঠিটা এসেছে চারদিন আগে। সময় দেওয়া আছে ন'টা আট। তার মানে একেবারে দিনের শুরুতে। ন'টায় তাদের অফিস খোলে। চিঠিটা কম্পোজ কবা শেষ হয়েছে ন'টা আটে। মানে তাকে চিঠি লেখাটাই ছিল রোহিত ভাটনগরের সেদিনের প্রথম কাজ। এই গুরুত্বটা রিমিকে কোনও তৃপ্তি তো দিলোই না উলটে মানুষটার সম্পর্কে তার যে বিরক্তি তা একটু বাড়াল।

প্রথম লাইনে রোহিত লিখেছে ঃ ইফ উই হ্যাভ এনি প্রবলেম দেন হোয়াই ডোন্ট উই সিট্ টুগেদার ফর অ্যা হোয়াইল? ওনলি অ্যা মিটিং ফর অ্যা হোয়াইল কুড সলভ অল দ্যা প্রবলেমস বিটুইন আস। স্বভাব চরিত্র যাই হোক ইংরেজিটা বেশ লেখে। মনে-মনে তারিফ না করে পারল না রিমি। মিটিং ফর অ্যা হোয়াইল—কয়েক মুহূর্তের এক সাক্ষাৎকার তাদের মধ্যের সব সমস্যা দূর করে দেবে—এমনি পড়তে বেশ, কিন্তু এই 'তাদের মধ্যে' কথাগুলো আসছে কোথা থেকে? 'তাদের' মানে? হ্যাঁ এটা ঠিক রোহিতকে তার ভালো লেগেছিল। কিন্তু

আসার আগে তো পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে রোহিত ভাটনগরের সঙ্গে তার কোনও রিলেশান গ্রো করতে পারে না। পারে না মানে হয়ই না।

'নিউওয়েভস্ গার্মেন্টস'-এ তাদের দেখা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন গ্রহ থেকে আগত দুটি প্রাণী। যাদের মধ্যে সবকিছু হতে পারে শুধু ভালোবাসা হতে পারে না। না-হলে তো কবেই ভালোবাসা হয়ে যেত। রোহিত ভাটনগর কি তাকে কম কিছু দিয়েছে? এই পৃথিবীতে খুব কম মানুষই আছে যারা ওঁর মতো মানুষকে দিতে পারবে। মা তো শুধু তার মাইনের অঙ্কটা জানে। অফিসের যে ফ্ল্যাটে থাকত সেইরকম সুন্দর ফ্ল্যাট মা বাস্তবে দেখেনি। দেখে থাকলে টিভিতে ইংরেজি সিনেমায় দেখেছে। নীলকান্তমণির মতো নীল রঙের কার্পেট দিয়ে মোড়া মাঝারি মাপের ফ্ল্যাটটা। তার প্রান্তরেখায় এসে শেষ হয়েছে ক্রিম রঙের দেওয়াল। দেওয়ালের গায় কালচে রঙের পালিশে চারপাল্লার জানলা। গোল্ডেন কারুকার্যময় রিং থেকে সাদা ফেনিল পরদা তার দু-পাশে। ক্রিম রঙের দেওয়ালের বুকে আটকে আছে পাতলা টিভি। স্পিলট এ. সি.-র হিমেল হাওয়ায় ডুবে আছে সেই ঘর। বেডরুমের দরজা খুললেই সুদৃশ্য ডাইনিং কাম ড্রয়িং। রট আয়রণের ডাইনিং টেবিল। কাঠের স্ট্যান্ডিং পার্টিশনের ওপাশে সোফা। পাশেই গাছের গোড়া কেটে বানানো সুদৃশ্য স্ট্যান্ডের ওপরে কর্ডলেস ফোন। ডান হাতে কিচেন। মাইক্রোওভেন থেকে শুরু করে গরম ধোঁয়ার সাহায্যে প্লেট-গ্লাস শুকিয়ে ফেলার যন্ত্রও সেখানে আছে। আর এরইসঙ্গে ফার্নিচারের মতো দুজন কাজের

লোক। ফ্রিজ, ওয়াশিংমেসিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে শুধু রিমির আদেশ শোনার অপেক্ষায়।

এইসব কিছু প্রথমদিন দেখিয়ে রোহিত ভাটনগর অমায়িক হেসে বলেছিল, অল দিজ আর ফর ইউ ম্যাম। তখনও রিমি জানত না এগুলো আসলে কিছুই নয়, এর হাজার গুন রোহিত ভাটনগর তার জন্যে রেখে দিয়েছে অফিসে।

রিমি 'নিউওয়েভ গার্মেন্টস'—এ জয়েন করেছিল সংস্থার আর পাঁচজন ফ্যাশান ডিজাইনারের একজন হয়ে। কিন্তু সাত-আট দিন চাকরি করার পরে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করতে শুরু করল। তার আগে থেকে যেসব ডিজাইনাররা ওখানে কাজ করছে তারা তাদের ডিজাইন এনে দেখাচ্ছে রিমিকে।

প্রথম-প্রথম রিমি ভেবেছিল একজন কো-ডিজাইনারকে আরেকজন কো-ডিজাইনার তার নিজের কাজ দেখিয়ে সামান্য মতামত চাইছে মাত্র। কিন্তু কয়েকদিন পরে জানল ব্যাপারটা তা নয়। রোহিত ভাটনগর নির্দেশ দিয়েছেন যে যা ডিজাইন তার টেবিলে প্লেস করবে সেটা তাকে দেওয়ার আগে রিমিকে যেন দেখিয়ে নেয়, রিমির পছন্দ হলে তবেই যেন জমা দেয়। কথাটা শুনে অবাক হয়েছিল রিমি। মাত্র এইকটা দিনের মধ্যে তার ওপরে এতটা আস্থা জন্মে গেল রোহিত ভাটনগরের। কথাটা ওনাকে জিগ্যেস না করে পারেনি।

রোহিত ভাটনগর হেসে বলেছিল ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের দিনেই তোমার কাজ দেখে বুঝে গেছি ইউ হ্যাভ অ্যা ইনোভেটিব ব্রেন। তোমার কাজের সঙ্গে ট্র্যাডিশানের কোনও রিলেশান নেই,

তোমার কাজের তুলনা শুধু তুমি। কথাগুলো শুনে কীরকম যেন হয়ে গিয়েছিল রিমির মনটা। সফল ব্যবসার গুণে শুধুমাত্র বিশাল অর্থের মালিকই নন, শিল্পের সমঝদার। তার কাজ তাহলে বেশ মন দিয়ে দেখেছে। রোহিত ভাটনগর শুধু তার কল্পনা শক্তি তার সৃষ্টির প্রশংসা করেই থেমে যায়নি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বটা রিমিকেই দেওয়া হচ্ছে, সকলে জানবে রোহিত ভাটনগর করে, আসলে করবে রিমি। তারজন্যে আলাদা অর্থও পাবে। মানে মাইনে বাইশ হাজারের পরে।

যেদিন দায়িত্বটা পেয়েছিল সেদিন তার কোয়ার্টার মানে সেই বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে ফিরেছিল রোহিত ভাটনগরের গাড়িতে লিফট পেয়ে। গাড়িতে আসতে-আসতে মনে হচ্ছিল স্বপ্নের মতো জীবনটা যেন নিজের ইচ্ছেতে ভাসছে। চাকরিটা নিয়ে এখানে আসার পরে, আট-ন'টা দিন যেতে-যেতে বুঝে ফেলেছিল, এখন লাইফ মানে সৃষ্টিশীল থাকো প্রতিটি মুহূর্তে। কথাটা এমনি শুনতে ভালো। আসল মানে তোমায় বাইশ হাজার দিয়ে কিনেছি, শয়নে স্বপনে যতক্ষণ বেঁচে আছ পুরোটাই আমাদের নিয়ে ভাবো। কিন্তু এখন তো বুঝতে পারছে যা সে ভেবেছে তা কতটা ভুল। শুধু নেওয়া নয়, দিতেও পারেন রোহিত ভাটনগর। এই বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, ওই বাইশ হাজার টাকার চাকরি, তারপরেও আলাদা টাকা এগুলো রিমিকে ডুবিয়েছে অদ্ভুত এক প্রিয়তায়। কিন্তু আজ যেটা দিলেন—ডিজাইন সিলেকশানের চূড়ান্ত ক্ষমতা—এটা দিয়ে তো বুঝিয়ে দিলেন শুধু এই বৈভব দেওয়ার যোগ্যতাই নয়, তোমার এই রক্তমাংসের শরীরের ভিতরে যে গুণ, তোমার শৈলী, তাকে

সম্মান করার যোগ্যতাও আমার আছে। খুব ভালোলাগছে রোহিত ভাটনগরকে।

সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় ইচ্ছে করছে রোহিত ভাটনগরকে জম্পেস করে চুমু খেতে। পরমুহূর্তেই জিভ কেটে ছিল মনে-মনে। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, বসকে চুমু! রোহিত ভাটনগর কী বুঝেছিল কে জানে। অদ্ভুত হাসি-হাসি মাখা মুখ নিয়ে গাড়িতে সারাটা পথ তাকিয়ে ছিল রিমির দিকে। ঠোঁটের ওপর থেকে হাসির ভাবটা যেন বেশি লেগেছিল চোখে।

ফ্ল্যাটের সামনে গাড়ি থামতে নেমেছিল রিমি। রোহিত ভাটনগর খুব মিষ্টি করে বলেছিল ও.কে. সি.ইউ.। রিমি বলেছিল থ্যাঙ্কস্ অ্যা মিলিয়ান। একটা সি. ইউ.-র বিনিময় এক মিলিয়ন থ্যাঙ্কস্ জীবনে প্রথম দিয়েছিল রিমি। তারপর সারাটা রাত স্বপ্ন সুখের এক প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবেছিল। পরের দিন ছিল রবিবার। তারপরের দিন মানে সোমবার অফিসে গিয়ে নিজের ড্রয়ার খুলে পেয়েছিল একটা লেডিজ কনডোম। এখানে শপে দেখেছে রিমি। কিন্তু তার ড্রয়ারে এল কী করে। কে রাখল। সুখের শেষ রেশটুকু তখন মুছে গিয়ে শুধু এই প্রশ্নগুলো তোলপাড় করছে ভিতরে তখন। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ইনটারকমে রোহিত ভাটনগরকে নালিশ জানিয়েছিল। ব্যস্ততা দেখিয়ে রোহিত রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল। আর নামিয়ে রাখার মুহূর্তকয়েক পরেই বেজে উঠেছিল রিমির মোবাইল। রোহিতের ফোন। অবাক হয়েছিল, ইন্টারকম নামিয়ে রেখে মোবাইলে কেন? ও, অন্যকেউ যাতে না শুনতে পায়? অজানা এক উষ্ণ আবেগ নিয়ে নিজের মোবাইল অন্ করে চেপে

ধরেছিল কানের ওপরে। রোহিত বলেছিল, আমি তোমায় সব দিলাম তুমি তোমার সবটা দিতে পারবে না!

—মানে! চমকে উঠে বলেছিল রিমি।

—মিনিং ইজ ভেরি সিম্পল, আই অফারড মাই এভ্রিথিং নাও ইউ সুড...

বোবা হয়ে গিয়েছিল রিমি। কিছু বলতে পারছিল না।

রিমিকে চুপ করে থাকতে শুনে রোহিত বলেছিল, তুমি বুঝতে পারছ না আই অ্যাম সিরিয়াসলি ইন লাভ, আই লাভ ইউ রিমি...

রিমি বুঝেছিল রোহিত ভাটনগরের কাছে লাভ মানে লেডিজ কনডোম। সজলের সঙ্গে যে জিনিসটা গড়ে উঠতে-উঠতে ভেঙে গেল, কীরকম একটা তেতোভাবে শেষ হয়ে গেল, সেটা যে আবার নতুন করে গজিয়ে উঠছিল ভিতরে, গড়তে শুরু করেছে মাত্র একদিন আগে, আজ সোমবার, গতকাল গেছে রবিবার, তার আগের দিন, মানে শনিবার তাকে রোহিত ভাটনগর নতুন দায়িত্ব দিলেন। বাড়তি টাকার কথা বললেন। গাড়িতে লিফট দিলেন। লোকে বলে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা। তার মনে হচ্ছিল সে পেয়েছে আস্ত রাজত্ব আর রাজপুত্র। মাত্র একটা দিনের ব্যবধানে কী হারিয়ে যেতে পারে একটা আস্ত রাজত্ব? হয়তো পারে। না হলে লাভের মানে কী করে লেডিজ কনডোম হয়?

মা কি এই রাজ্য হারিয়ে যাওয়ার ব্যথা একবারের জন্যেও লক্ষ করেছে তার চোখে? নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খাওয়ার টেবিলে বসেছে। খাচ্ছে। খাচ্ছে তার দাঁত, জিভ—সে যেন খাচ্ছে

না। মা খুঁচিয়ে যাচ্ছে। রোহিতের ই-লেটারটার উত্তর দিয়েছিস তো? চাকরির ব্যাপারটা সব ঠিকঠাক আছে? ভালো বলতে হয়, তুই যাচ্ছিস না, যোগাযোগ করছিস না, তাও দেখ কীরকম চিঠি পাঠাল। হুঁ, হ্যাঁ করে উত্তর দিচ্ছে রিমি। আর নিজেই নিজের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। এবার আর ধরে রাখত পারল না নিজেকে। বেশ চেঁচিয়ে উঠল। বলল, খেতে দেবে না-দেবে না। বলেই আর মুহূর্তও ব্যয় করল না। জলের গেলাস থেকে বেশ কিছুটা জল ঢেলে দিল পাতে। উঠে চলে গেল বেসিনের সামনে। মুখ ধুয়ে এক স্ট্র্যাপের ব্যাগটা কাঁধে ফেলে জুতো গলিয়ে নেমে এল সিঁড়িতে। বেসিনে হাত ধুয়ে 'রিমি-রিমি' করতে-করতে মেন দরজার দিকে ছুটে এল কাবেরী। কিন্তু রিমির নাগাল পেল না।

আজ রুক্ষ্ম হালকা হিম-হিম এক হাওয়া দিচ্ছে। স্নান না করায় রিমির যেন ঠান্ডা একটু বেশিই লাগছে। রাগের মাথায় বেরিয়ে পড়েছে তাই গরম কিছু গায়ে জড়ানোও হয়নি। একবার রিমি ভাবল বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই মনে হয় ভালো। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল, না, এখন বাড়ি ফেরা মানে সম্পূর্ণ সারেনডার করে দেওয়া, মানে মার কাছে হেরে যাওয়া। সেটার কোনও মানেই হয় না। হাঁটতে-হাঁটতে হাজরাপার্কের সামনে চলে এসেছে রিমি। কোথা থেকে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে পার্কের ভিতরে। এইমুহূর্তে ওই রোদটুকুই অনেক। পা ফেলে-ফেলে পার্কের ভিতরে চলে এল রিমি। সিমেন্টের বেঞ্চে বসল রোদে পিঠ পেতে। মোবাইল অন করল সজলকে ধরবে বলে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সজলের কণ্ঠ ভেসে উঠল রিমির

কানে। শুধু একটা শব্দ ভেসে এসেছে। 'তুমি!' আর তাতেই রিমির মনে হল সজলের ভিতর থেকে উচ্ছ্বাস সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উঠে এসে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিল তাকে। 'অসহ্য!' মনে-মনে বলে উঠল রিমি আর ঠোঁট খুলে বলল, আদিখ্যেতা রাখো, কাল ফোন করেছিলে কেন!

—তুমি একথা বলছ!

—কেন! আমি একথা বলতে পারি না!

—তোমাকে আমি আজও ভালোবাসি রিমি।

—বাজে কথা রাখো, আমার নম্বরটা কোথা থেকে পেলে?

—সেটা কি খুব বড় কথা, তোমার নম্বরটা জোগাড় করে তোমাকে ফোন করেছি সেটাই বড় না?

—আমার কাছে তো ফিতে নেই, থাকলে মেপে বলতে পারতাম কোনটা বড় কোনটা ছোট।

—তুমি ঠিকই বলেছ, আসলে কী জানো তোমার অনেক কিছু আছে, নেই শুধু একটা ফিতে, থাকলে তুমি বুঝতে আমার ভালোবাসা কত বড়।

হেসে ফেলল রিমি, ভালোবাসা কী ফ্ল্যাট না শাড়ি যে স্কোয়্যারফুট বা এগারো হাতি বারো হাতি দিয়ে বোঝানো যাবে কত বড়! ভালোবাসাটা পাজেল ব্লকের মতো, প্রতিটি ব্লকই সমান, কিন্তু যেটার সঙ্গে যে-ব্লকটা মিলবে সেটা না লাগালে পাজেলটা সলভ হবে না কোনওদিন, এটাও ঠিক তাই, না মিললে ভালোবাসাটা ফর্ম করবে না...

—তুমি কী সুন্দর কথা বলো।

মনে-মনে হাসল রিমি। এই একটা ছেলে যে মনে করে প্রশংসা করে ফাঁসির আদেশ রদ করে দেওয়া যায়। ঠিক একইরকম রয়ে গেছে। আগেও যেমন তার সামনে এলে বা ফোন করলে প্রশংসার ঝরনায় ডুবিয়ে দিতে চাইত, আজও সেই চেষ্টা করছে। মাঝখানে যে এত সব বাজে ঘটনা ঘটে গেছে তার রেশ বিন্দুমাত্র নেই কথা বলার মধ্যে। রিমি বলল, এখনও সময় আছে সজল কিছু একটা করার চেষ্টা করো, মানে আমার কথা ভেবে নয়, আমার ভাবনা মাথা থেকে তাড়াও, আমি বলছি তোমার নিজের জন্যে...

—আমি তো করছি।

—কী করছ?

—দোকান করেছি।

—দোকান! আমি সে-কথা বলছি না...

কিন্তু কথা এগোতে পারল না রিমির। তাকে কেটে দিয়ে সজল বলল, মুক্তোর গয়নার দোকান করেছি গড়িয়াহাটে। হায়দ্রাবাদের নামী কোম্পানির ব্রান্ডেড মুক্তোর গয়না, কী সুন্দর সব আইটেম তুমি না দেখলে বুঝবেই না, তোমাকে দেখিয়ে খুব আনন্দ পাব আমি।

যা বলতে চাইছিল সেটাকে মনের এক কোণে সরিয়ে রেখে রিমি বলল, আমায় দেখাতে পারলে খুব আনন্দ পাবে কেন!

তুমি তো সেই একজন, যে সুন্দর তৈরি করে, তাকে সুন্দর জিনিস দেখাতে পারলে আনন্দ হবে না! কতটা সুন্দর তুমিই তো সঠিক বুঝবে।

রিমি বুঝল খুব একটা গভীরে গিয়ে, ভালোভাবে বুঝিয়ে কোনও লাভ নেই, তার থেকে সরাসরি সংক্ষেপে বলাটাই ঠিক। বলল, কিছু করা বলতে ব্যবসা বা চাকরির কথা আমি বলছি না, আমি বলছি এমন কিছু করো যাতে তোমার মনের খিদে মিটবে, শুধু তাই নয়, এই যে আমায় তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কষ্ট পাচ্ছ সেটা দেখবে মুছে যাবে যদি তুমি মনের খিদে মেটানোর জন্যে কিছু করো।

—তোমার কথা না কিছুই বুঝতে পারছি না!

—তোমার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে না? গান গাইতে? বা ধরো ছবি আঁকতে বা অভিনয় করতে? এরকম কিছু একটা করো দেখবে যত তুমি এগুলোর মধ্যে ডুবে যাচ্ছ তত তোমার কষ্ট কমে আসছে।

—তুমি আমার জীবনে ফিরে না এলে কোনওকিছুই আমার কষ্টটাকে কমাতে পারবে না।

রিমির মাথা ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে প্রেমে পাগলকে বোঝানোর থেকে অন্ধকে গোলাপফুলের রূপ বোঝানো বোধহয় সহজ। কিছুই বলতে পারছে না। রিমিকে চুপ করে থাকতে শুনে সজল আবার কথা বলায় খুব উৎসাহ পেয়েছে। বলল, এতদিন পরে তোমাকে ফোন করছি, তোমার গলা শুনতে পাচ্ছি বলে খুবই ভালোলাগছে, কিন্তু আরও ভালো লাগত যদি তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম...

রিমি হেসে উঠল। বলল, কেন আমার মায়ের প্রেমেও পড়েছ নাকি!

—ছিঃ, একথা তুমি বলতে পারলে!

রিমি কোনও উত্তর দিল না।

সজল বলল, তোমার মায়ের তো আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে একটাই আপত্তি ছিল যে আমি কিছু করি না, কিন্তু এখন তো আর সেই সমস্যাটা নেই, আমি তো দোকান করেছি...

রিমির কথা এগিয়ে নিয়ে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না। সজল যে-কথাটা বলছে জানে রিমি। ভবানীপুরে বিশাল বাড়ি সজলদের। আটঘর ভাড়াটে। জাহাজ লিজে ভাড়া নিয়ে কার্গো এজেন্সি খুলেছিলেন সজলের বাবা। বেশিদিন বাঁচেননি। বাহান্ন বছর বয়সেই পৃথিবীর টান ছিন্ন করে চলে গেলেন। তবে সংসার পথে বসিয়ে চলে যাননি। যাওয়ার আগে ব্যাঙ্কে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ফিক্সড্ ডিপোজিট আর দু-হাজার স্কোয়্যার ফুটের চারতলা বাড়ি তৈরি করে রেখে যান সজল আর সজলের মায়ের জন্যে। তাই আজ এইমুহূর্তে সজল যদি বিয়ে করে এবং কোনও ধরনের প্রফেশানে না থাকে তবেও ওর সংসার চালানো বলতে যা বোঝায় সেটা চালাতে কোনও অসুবিধাই হবে না। ফলে সে নিয়ে কোনও চিন্তা ছিল না রিমির। চিন্তা ছিল মায়ের। সেই চিন্তা থেকেই পাড়ার ছেলেদের বলে ঝুটঝামেলা করে তার আর সজলের সম্পর্কটাকে ছিন্ন করে মা। তখন খুব খারাপ লেগেছিল রিমির। কিন্তু পরে মনে হয় মা-ই তাকে বাঁচিয়েছে। এই যে মা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সেটা সজলকে এখনও পর্যন্ত বলা হয়নি রিমির। সজল জেনে রয়েছে তার আর রিমির মাঝখানে মা-ই হচ্ছে পাহাড়। দোকানটা করার পরে তাই আর তর সয়নি খবরটা

দেওয়ার জন্যে। ভাবছে মা দোকান করার খবরটা পেয়ে গেলেই ফের তাদের প্রেমপাখি ডানা মেলে উড়বে আকাশে। আজ বলে দেওয়াই ভালো। বলে দেওয়া মানে আসলে সজলকে একটা কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। খোঁড়া ঘোড়াকে যেমন গুলি করে মুক্তি দেওয়া হয় তেমনই।

কিন্তু উত্তরটা দেওয়ার আগে জেনে নিতে হবে তার নম্বরটা পেল কার কাছ থেকে। কারণ সকালে ঘুম ভাঙার পরে যখন আবিষ্কার করেছিল এটা সজলের নম্বর তখন সবচেয়ে বেশি যেটা চিন্তায় ফেলেছিল রিমিকে সেটা হল তার মোবাইল নম্বর কোথা থেকে পেল সজল। জায়গাটা কোথায়? তার বিরুদ্ধ কোনও লোক নয়তো? তাহলে তো সর্বনাশ। সজলকে ঝেড়ে ফেলা তো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

প্রেমিকাকে অনুরোধ করার ব্যাপারে এল.আই.সি. বা পিয়ারলেসের এজেন্টদের লজ্জায় ফেলে দেবে সজল। প্রেমিকার মুখের ওপরে অপমান গায় মাখে না সেরকম একজন যদি তার বিরুদ্ধে কোনও জায়গা থেকে সাহায্য পায় তাহলে তো আর করার কিছুই নেই। যা কিছু করার আজই করতে হবে। নিজেকে ভিতরে তাই গুছিয়ে নিল। মিষ্টি করে বলল, আচ্ছা এই সারপ্রাইজ ফোনটা যে পেলাম তারজন্যে আসল থ্যাঙ্ক ইউটা কার প্রাপ্য? মানে নম্বরটা কে দিল?

—তোমার অনিন্দিতামাসি। সজলের কণ্ঠস্বরে রসগোল্লার রস জ্যাব-জ্যাব করছে। সামান্য একটু প্রশংসা করলেই হল। মানে চায়ের কাপে দু-চামচ চিনি দেওয়ার পরে আরেক চামচ চিনি

দিলেই হল, যা জানতে চাইবে রিমি মুহূর্ত দেরি না করে বলে দেবে সজল। কিন্তু অনিন্দিতা মাসি শব্দ দুটো কানে যেতেই ভেতরটা জ্বলতে শুরু করেছে রিমির। নামটা বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। আর একটা জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া দংশন করে পালাচ্ছে।

কাল রাতে মা-বাবার শোওয়ার ঘরের ভেজানো দরজার সরু ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা মায়ের কথার মধ্যে জেনেছে অনিন্দিতামাসিই প্যান্টালুনসের সামনে সুব্রতর সঙ্গে আইসক্রিম খেতে দেখেছে। কোনও কিছু যদি খারাপ লাগত তবে তাকেই বলতে পারত। কিন্তু বলেনি। বলেছে মাকে। মাকে আবার বলেছে রিমি যেন না জানে তিনিই খবরটা দিয়েছেন। মা'র কাছে তার মোবাইল নম্বর আছে। মা'র বান্ধবী হিসেবে নম্বরটা পেয়েছে। বেছে-বেছে আর কাউকে না সজলকেই দিয়েছে। অনিন্দিতামাসি তো সব জানে। গুজরাটে ফ্যাশান ডিজাইনিং পড়তে যাওয়ার আগের সেই দুটো বছর। অনার্সের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। পোস্ট-গ্রাজুয়েটে কী করা যায় তা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা পরিকল্পনা চলেছিল। ওই সময়টাতে জড়িয়ে গিয়েছিল সজলের সঙ্গে। সে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পথেও কত ঘটনা। মা যদি জানতে পারে অনিন্দিতামাসি তার মোবাইল নম্বর সজলকে দিয়েছে তাহলে ওনার কী আর রক্ষে রাখবে মা। এখনই ফোন করে মাকে কথাটা জানিয়ে দেবে? ভাবল, কিন্তু ইচ্ছেটাকে চেপে রাখল। আগে সুব্রতকে সব কথা বলতে হবে। আলোচনা না করে তাই কিছু করা ঠিক হবে না। তাই সেই কথাটায় চলে আসতে চাইল। যেটা বলে সজলকে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে চায় রিমি।

দু-চারটে আরও এলেবেলে কথা বলার পরে রিমি বলল, আচ্ছা একটা কথা বলি, মানে যেটা আসল কথা, তুমি বলছিলে না সমস্যাটা আর নেই, মানে তুমি বেশ ভালো একটা ব্যবসা করছ জানলে মায়ের আর আপত্তিটা থাকবে না—ব্যাপারটা আসলে তা নয়, সমস্যাটা মায়ের আপত্তি নয়, মা যদি না ওসব ঘটনা ঘটাত আমিই তোমায় কয়েকদিনের মধ্যে না বলে দিতাম।

—না বলে দিতে, তুমি কি বলছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না! তুমি দেখো প্রায় চারটে বছর তোমার সঙ্গে দেখা নেই, তোমার মা ক্লাবের ছেলেদের হাতে মারও খাইয়েছেন। তবু দেখো আমি কিন্তু তোমায় ভুলিনি...

কিছু বলতে পারছে না রিমি। আসলে তো রিমি বলতে চাইছে এটাই তো সমস্যার, এই যে এত ভালো তুমি এটাই তো অসহ্যের। আমি তো কোনও রোবট চাই না। আমার আদেশ, আমার অপমান সব শুনবে! আমি তো চাই সেইরকম একটা লোক যে আমাকে দ্বন্দ্ব দেবে, দ্বন্দ্ব থেকে কোনও নতুন ভাবনা পাব আমি, তার ভাবনার মধ্যে ঢুকে যাব আমি, তার ভাবনার ভিতরে বাস করব, তার নতুন-নতুন ভাবনায় আমি চমকে যাব, নেশাগ্রস্তের মতো ডুবে যাব তার ভাবনায়। তোমার কোনও ভাবনা নেই সজল, তুমি কিছু ভাবতে পারো না, নিজের কোনও কথা শোনাতে পারো না, শুধু আমার সামনে বসে আমার প্রশংসা করে যাও। আমি যখন প্রশ্ন করি ঠিক করে বলত আমার কোনটা তোমার সবচেয়ে প্রিয় তুমি বলতে পারো না, আমার তখন কি বিরক্তি লাগে তোমায়

বলে বোঝাতে পারব না। তোমার শুধু আছে সুদর্শন একটা চেহারা, ওটাই তো আমাকে ঠকাল সজল। এসব কথা কিছুই বলল না রিমি। খুব থেমে-থেমে গলা সামান্য ভারী করে বলল, একটা কথা ভালো করে শোনো, মা তোমাকে ক্লাবের ছেলে দিয়ে মার খাইয়েছিল আমি কিন্তু ক্লাবের সাহায্য নেব না সোজা যাব পুলিশে। আর বললেই তো জুয়েলারির দোকান করেছ সবে, ফলে বুঝতেই পারছ, আগেরবার শুধু মা'র অভিযোগ ছিল, আমার ছিল না, এবার কিন্তু আমি অভিযোগ করব।

ফোনটা কেটে দিল রিমি।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। এক-একটা অদ্ভুত দিন যায়। রোহিত ভাটনগরের ই-লেটার। সজলের ফোন। ফোনে সজলকে ধরা। একটা ঘটনা থেকে পার পেতে না পেতে আরেকটার খপ্পরে পড়া। তারওপরে আধপেটা খেয়ে রাগের চোটে বেরিয়ে পড়েছে। এটা যে কতবড় ভুল এখন বুঝতে পারছে। শরীরের ভিতরটা যেরকম করছে তাতে এই পার্কের ভিতরেই যদি কিছু হয়ে যায় কী হবে তার! মনে জোর এনে পার্কের সিমেন্টের বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল রিমি। একটা রিকশা পেলেই হল।

মন্দিরের সামনে বাঁ-দিকের রাস্তা। গলির মুখে কোচিং সেন্টারের বোর্ড ঝুলছে। সুব্রতর বাড়ির পথনির্দেশ ঝালিয়ে নিল মনের মধ্যে। শুধু মনে হচ্ছে সুব্রতর কাছে পৌঁছতে পারলে সব সমাধান পেয়ে যাবে। হাজরাপার্ক থেকে বেরিয়ে ট্রামলাইন পেরিয়ে এ-পারে চলে এল রিমি। হাত তুলে একটা রিকশা থামাল। উঠে বসল। চাকা গড়াতেই রিমির মোবাইল বেজে উঠল। রিমি দেখল

কলিং সুব্রত। সকালে একবার ফোন করেছে। পাইনি বলে এখন আবার। কিন্তু রিমির অন্য কথা মনে এল। সুব্রতকে তার দরকার। কাল রাতে স্বপ্নের সেই আঙুলগুলো ঠিক কার আঙুল জানার জন্যে যেমন সুব্রতকে দরকার ছিল, দুপুরে মায়ের সঙ্গে যা ঘটেছে তার পরে দরকার পড়েছে আবার। ফলে তার ফোন করাটা স্বাভাবিক ছিল অথচ সুব্রতই তাকে ডাকছে! এর আগে সুব্রতর সঙ্গে চারবার দেখা হয়েছে। আজকেরটা হলে হবে পঞ্চম। আগের চারবার দেখা হওয়ার কোনও কথাই ছিল না কিন্তু হল। আজ সুব্রতর ফোন করার কোনও কথা ছিল না। অথচ সুব্রত তাকে ডাকছে। আচ্ছা ওই যে একটা কথা আছে না—ডেসটিনি। তার ডেসটিনি কী সুব্রত? না হলে তার মতো সফল ফ্যাশান ডিজাইনার এত জায়গা ঘুরে এখন এই পড়ন্ত শীতের বেলায় রিকশায় চড়ে কালীঘাট মন্দিরের কাছে গঙ্গামুখী প্রাচীন বাড়িতে তার বাবার বন্ধু যে মানুষটা তার মধ্যে নিজের আশ্রয় খুঁজতে যাচ্ছে কেন! ডেসটিনি বলেই কি যাচ্ছে?

রিমির মনে হচ্ছে রিকশাটা গিয়ে যেখানে থামবে সেখানেই রাখা আছে তার জন্যে একটা শান্তি। অনেক খোঁজের পরে জায়গাটার খোঁজ যেন পাওয়া গেছে অবশেষে। আবার বেজে উঠল কলিং সুব্রত। এবারেও কেটে দিল রিমি। যার মুখোমুখি বসে একটু পরে কত কথা বলবে, কথায়-কথায় ভেসে যাবে, তার সঙ্গে এখন ফোনে কথা বলে কী হবে। রিমি বুঝতে পারল পার্কের বেঞ্চ থেকে ওঠার সময় মাথায় ভিতরে যে ঝিমঝিম করা ভাবটা ভেসে উঠেছিল সেটা আর বিন্দুমাত্র নেই এখন।

॥ ছয় ॥

—না-না, তুমি বুঝতে পারছ না রিমি, আমি ভয় পাচ্ছি তুমি ভেবো না, বা কে কী ভাবছে তা নিয়েও আমি কোনওদিনই মাথা ঘামাইনি আজও ঘামাচ্ছি না, আসল ব্যাপারটা কি বলত, শুভেন্দুর সঙ্গে আমার তো একদিন দু-দিনের পরিচয় নয়, পঁয়ত্রিশ বছরের ওপরে ওর সঙ্গে আলাপ। হাসল সুব্রত। গালের মিহি কাঁচাপাকা দাড়ি চুলকে নিল একবার। বলল, এটাকে তো কোনও মতেই অস্বীকার করা যায় না, কী বলো তুমি...

রিমি সামনের খোলা জানলা দিয়ে বাইরে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ছিল। কত আশা নিয়ে পৌঁছেছিল সুব্রতর কাছে। কিন্তু সেইসব আশার কাছ থেকে একটু-একটু করে সে দূরে চলে যাচ্ছে। এখন সুব্রত এরকমভাবে কথা বলছে কেন! এইসব কথা বলছে কেন! গঙ্গার দিক থেকে ছলছলে চোখে ফিরল সুব্রতর দিকে। বলল, আপনাকে যে-কথাগুলো বললাম না, এ-কথাগুলো এর আগে এত স্পষ্ট করে কাউকে বলিনি, আপনি কী আমার অবস্থাটা কিছুই বুঝতে পারছেন না!

—খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি। অত স্পষ্ট করে না বললেও আমি বুঝতে পারতাম রিমি। বুঝতে পারতাম বললে ঠিক বোঝানো হয় না বলা উচিত প্রথম দিনেই আমি বুঝতে পেরেছি।

রিমি একটু অবাক হয়ে বলল, প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলেন!

—হ্যাঁ, যেদিন কুকুরটাকে ক্রেশে রাখতে যাচ্ছিলাম, তখন

এককথা দু-কথার পরেই আমি বুঝতে পারলাম তুমি ভীষণ একা, একজন সফল ফ্যাশান ডিজাইনার, এত টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কার সঙ্গে বকে চলেছ, না যে একটা কুকুরের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে চলেছে। আমি বুঝেছিলাম শুধু একাই নয়, মনের আশ্রয় খোঁজার জন্যে তুমি মরিয়া একটা চেষ্টা করছ, আমার খুব কষ্ট হয়েছিল জানো!

—এখন আর কষ্টটা হচ্ছে না?

—কেন হবে না।

—তাহলে আপনার কাছে আমায় আসতে বারণ করছেন কেন! বেশ উষ্মা নিয়ে কথাটা বলল রিমি।

ফের সুব্রত তার নিজস্ব শান্ত হাসিটা হাসল। বলল, তোমায় বললাম না শুভেন্দু ফোন করেছিল...

রিমি এবার ওর ভিতরে গড়ে ওঠা হতাশা, দুঃখের অনুভূতি ভুলে গেছে। সুব্রতকে ভালোভাবে কথা শেষ করতে দিচ্ছে না। সুব্রতকে একরকম কেটে দিয়েই বলল, বাবা ফোন করে কিছু কথা বলল বলেই আপনি চান না রিলেশানটা গ্রো করুক! বাবা তো কবিতা লেখে, পত্রিকা প্রকাশ করে, কবিতা পাঠের আসর বসায়, মানুষ নিয়ে জীবন নিয়ে কতসব গভীর কথা বলে অথচ তার সন্তান তার মেয়ে একটা বেদনা নিয়ে প্রতিমুহূর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা চোখের সামনে থেকেও বুঝতে পারে না—সেরকম একটা মানুষ ফোন করে কতগুলো কথা বলল আর আপনি সেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন! সত্যি! আর বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে বাবা আপনাকে যা বলেছে, মানে যে-কথাগুলো আপনি আমায় বললেন সেগুলোও কি

বাবার বলা মানায়! বাবা তো মাকে প্রেম করে বিয়ে করেছিল অথচ মার কোনও একটা দরকার বাবার মনে থাকে না, মনে থাকবে কী করে! মন জুড়ে তো তপতী ভট্টাচার্য, সেই মানুষটা কী করে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে মতামত দেয়! আর দিলেও বা সেটাকে অত গুরুত্ব দেওয়ার কী আছে!

একদমে এতগুলো কথা বলে ফেলার জন্যে রিমির দমে ঘাটতি পড়েছে। ঠোঁট স্বল্প ফাঁক করে বাতাস টানল। সেটা দেখে সুব্রত বলল, জল খাবে? সিঙ্গেল খাটের পাশে তেপায়া পুরোনো দিনের কারুকার্যময় টেবিল। তার ওপরে একরাশ গল্প-উপন্যাস-কবিতার বই। থাক থাক ক্যাসেট। রেডিওসেট। পুরোনো টেপরেকর্ডার। আরও কিছু টুকিটাকি। তার পাশ থেকে একটা জলের বোতল তুলে এগিয়ে ধরল রিমির সামনে। রিমি সুব্রতর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, থাক, হয়েছে।

সুব্রত হেসে ফেলে বলল, খুব রাগ হয়েছে না...

—হবে না, আমি এসেছি আপনাকে কতগুলো খবর দিতে, আপনার সঙ্গে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে আর, প্রথমেই আপনি বললেন বাবা অফিসে গিয়েই নাকি আপনাকে ফোন করেছে। কী বলেছে তার জন্যে আমার সঙ্গে আপনার আর দেখা হওয়া উচিত নয়—এইসব বলে চলেছেন! তা রাগ হবে না!

সুব্রত আবার হাসে, দু-চোখে কৌতুক এনে বলে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ছিল?

—হ্যাঁ, আমাদের খবরটা মাকে কে দিয়েছে জানেন?

—কে?

—অনিন্দিতামাসি।

—অনিন্দিতামাসি?

—আপনি চেনেন না? ডোভারলেনে থাকে।

—তোমার মায়ের বন্ধু তো, তোমাদের বাড়িতে তো প্রায় সব অনুষ্ঠানেই দেখি।

—হ্যাঁ, চেনেন তো, উনি মাকে প্যান্টালুনসের সামনে আমাকে আপনাকে আইসক্রিম খেতে যে দেখেছে সেটা ফোন করে বলেছে, শুধু এই খববরটাই না আমার মনে হয় রংচং মাখিয়ে এমন কিছু বলেছে যাতে মা আপনার আমার ব্যাপারে একেবারে খেপে উঠেছে।

সুব্রত হাসল। বলল, তুমি জিগ্যেস করছিলে না চিনি কিনা, ব্যাপারটা কী বলত চেনা দু-রকম, একটা হচ্ছে চেনা, আরেকটা হচ্ছে হাড়েহাড়ে চেনা, আমি ওনাকে চিনি ওই দ্বিতীয় পদ্ধতিতে, মানে হাড়েহাড়ে চিনি...

রিমি অবাক হয়ে বলল, ঠিক বুঝলাম না তো।

—আমি তো তোমাদের বাড়িতে শুধু অন্যদের মতো কবিতাপাঠের আসরেই যাই তা তো নয়, বা ধরো তোমার বাবাকে প্রুফ দেখার ব্যাপারে হেল্প করার জন্যে যে শুধু যাই তাও নয়, তোমাদের অনেক পারিবারিক অনুষ্ঠানেও আমি গেছি, তার কিছু-কিছু তো তুমি জানো। তা তোমার অনিন্দিতামাসিকে আমি তোমাদের বাড়িতে অনেকবার দেখেছি। যখনই ওনার দিকে ভালো করে তাকিয়েছি একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে, ভালো করে

কয়েকমুহূর্ত তাকালেই উনি চোখ নামিয়ে নেবেন। এটা কিন্তু সেই বিরক্তিতে চোখ নামিয়ে নেওয়া নয়, কখন-কখন হয় না ড্যাবড্যাবে চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—বিরক্তিকর, এটা কিন্তু তা নয়, এটা যেন লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নেওয়া, আমার খুব মজা হতো, উনি চোখ নামিয়ে নিলেও আমি তাকিয়ে থাকতাম, উনি হয়তো এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে আবার আমার দিকে তাকিয়েছেন আর আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দেখে ফের চোখ নামিয়ে নিলেন, আমি বুঝতে পারতাম ওনার মধ্যে এখনও প্রেম আছে। এই যে উনি বিবাহিতা, এত বছরের দাম্পত্য, মেয়ে বড় হয়ে গেছে—এগুলো ওনার ভিতরের প্রেমকে চাপা দিয়ে দিতে পারেনি, তুমি কখনও দেখেছ ভাঙা ইটের পাঁজার ভিতর থেকে সবুজ চারা গাছ উঠে এসেছে? আমি দেখেছি। ওটা দেখে কী মনে হয়েছে জানো? ওই জায়গাটাতে, মানে যেখানটায় ইটের পাঁজাটা রয়েছে সেখানটায় মাটির নিচে পৃথিবীর হৃদয়ে কত প্রাণ! আলো বাতাস সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তবুও নিশ্বাস নিচ্ছে পৃথিবীর হৃদয়। আর প্রশ্বাস হয়ে যেন বেরিয়ে এসেছে সবুজ চারাগাছটা। আর অনিন্দিতার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল নিশ্বাস নিচ্ছে ঠিকই কিন্তু সবুজ চারাগাছটা বেরিয়ে আসতে পারছে না।

এ পর্যন্ত বলে থামল সুব্রত। রিমির চোখের ওপরে চোখ রেখে বলল, বোর হচ্ছো না তো?

কী বলবে রিমি! এমন সুন্দর ভাবে কথা বলতে কম মানুষকেই দেখেছে। আর কথা শুনতেই তো এসেছে। শুধু আজ নয়, আরও আসতে চায় রিমি। এক জীবন ধরে শুধু কথা শুনবে

সুব্রতর। সেদিন গঙ্গার ধারে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে সামনেই চোখের ওপরে ভেসে থাকা প্রকৃতির বর্ণনা দিচ্ছিল, তখন রিমির মনে হয়েছিল এরকম একটা মানুষ পেলে শুধু কথা শুনেই একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। অথচ সেই মানুষটার সবকথার মধ্যাকথা হল তুমি আর এসো না। কেন আসবে না, এর আগে যাদের কথা শুনেছে তাদের কারুর সঙ্গেই তো সুব্রতর তুলনা চলে না। সজলের কথা মানেই তো প্রশংসাবাক্য, বোকাবোকা প্রশংসা বাক্য। যখন ওর বন্ধুদের কাছে নিয়ে যেত, পরিচয় করাত রিমির সঙ্গে তখন সজলের চোখের দিকে তাকিয়ে রিমি দেখতে পেত ট্রফি জেতার আনন্দ। রিমি যেন এক সুদৃশ্য ট্রফি। আর সেটা জিতে যেতে পেরে বেজায় খুশি সজল। এরকম কারুর সঙ্গে প্রেম করা যায়? আর রোহিত ভাটনগর শোনাত তরক্কির গল্প। আরও কত উন্নতি করতে পারবে রিমি, আর সেই উন্নতি করতে গেলে ঠিক কি করতে হবে রিমিকে সেইসব কথা শোনাত, বোঝাত।

আর মার কথা মানে তো নিজেকে তৈরি করো, নিজেকে প্রেজেন্টেবল করো। সুব্রতর সঙ্গে দেখা না হলে তো সে বুঝতেই পারত না পৃথিবী নামক এক গ্রহতে সে এসেছে। ওদের বলা কথাগুলোর বাইরে আরও কতকিছু আছে সেটা তো সুব্রতর সঙ্গে দেখা না হলে অধরাই থেকে যেত। অথচ সে-ই তাকে তার কাছে আসতে বারণ করছে। কেন? এই ফয়সালাটা না করে যাবে না রিমি। তবে এখন থাক। সুব্রত যখন কথা বলছে তখন শোনা ছাড়া আর কোনও কাজ থাকতে পারে না। রিমি বলল, আপনি বলুন...

গঙ্গামুখী খোলা জানলার সামনে বেতের মোড়ার ওপরে বসেছিল সুব্রত। উঠে পড়ে বলল, দাঁড়াও একটু ঢেলে নিই। দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে পুরোনো আমলের দেওয়াল আলমারির পাল্লা খুলে একটা বোতল বের করল। রিমি দেখল যেখান থেকে বোতলটা বের করল সুব্রত তার পাশে অনেকগুলো ওইরকমই ফাঁকা বোতল রয়েছে। সুব্রত হেসে বলল তুমি আসার আগে খাচ্ছিলাম, তোমার সঙ্গে এমন সব সিরিয়াস কথা হল যে ভেতরের আমেজটা একেবারে কেটে গেল, তাই একটু নিচ্ছি। জলের রঙের তরল বোতল থেকে ছোট একটা কাচের গ্লাসে ঢালতে-ঢালতে সুব্রত বলল, তুমি কিছু মনে করছ না তো?

রিমি আবার অবাক। মনে করবে কি! এই যে প্রায় ঘণ্টা খানেকের ওপরে হয়ে গেল সে সুব্রতর ঘরে বসে আছে। সকালে বাবা ফোন করে সুব্রতকে কড়াকড়া কথা শুনিয়েছে। তাই ফোন করতে বাধ্য হয় সুব্রত। দুজনের মধ্যে আলোচনা চলছিল। বেশ সিরিয়াসলি কথা হচ্ছিল। তখন সুব্রত খাওয়া অবস্থাতেই? কই কথা বলা শুনে, আচরণে একটুও মনে হয়নি। এখন না বললে তো বুঝতেও পারত না। অথচ সুব্রতর মাল খাওয়া নিয়ে মার কত বক্রোক্তি! মাল খেয়ে-খেয়ে এই চুয়াল্লিশেই গালের ওপরে মেচেতার দাগ ফেলে দিল। আরে বাবা গালের ওপরে মেচেতার দাগ থাকতে পারে, কিন্তু ভিতরের স্নায়ুটা দেখ—পুরো টানটান, চাবুকের মতো। এরকম মানুষকে না ভালোবেসে পারা যায়? মা তুমি যে অত মাটি খুঁড়ে মাথা পাগল করে ফেলছ—কেন এত লোক থাকতে সুব্রতকে আমার ভালোলাগল, সেটা তোমায় বোঝাই

কি করে বলত মা? এসব কথা কি ঠিক বুঝিয়ে বলা যায়? এই যে এখন যেটা বুঝতে পারছি এটা তোমায় বোঝাই কী করে বলত? এগুলো তো বোঝানো যায় না, বুঝতে হয়। বোঝাতে গেলে তো বলবে ছোট হয়ে বোঝাচ্ছ। আমি আসলে কিচ্ছু বোঝাতে চাই না মা, শুধু বলতে চাই আমি মনের দিক থেকে এত একা হয়ে যাচ্ছি যে বেঁচে থাকাটা যেন আমার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রিমিকে চুপ করে থাকতে দেখে সুব্রত বুঝতে পারল তার মদ্যপানের ব্যাপারে ওর কোনও আপত্তি নেই। গ্লাসের তরলে জল মিশিয়ে মৃদু চুমুক দিয়ে চোখে হেসে সুব্রত বলল, হ্যাঁ যেটা বলছিলাম অনিন্দিতার সম্পর্কে, সবুজ চারাগাছটা বেরতে পারছে না দেখে আমার খুব কষ্ট হতো, কেন হতো আমি তোমায় ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। এই যে সেদিন কুকুরছানাটাকে ক্রেশে রাখতে গেলাম না, কেন গেলাম বলতো?

—কেন গেলেন?

—আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, যাদের বাড়িতে ওটা রয়েছে তাদের কোনও হেলদোল নেই! সতেরো দিনের জন্যে সাউথইন্ডিয়া বেড়াতে যাচ্ছে, কুকুরটা বাড়িতে, কে খেতে দেবে কে দেখবে জিগ্যেস করায় ক্যাজুয়ালি বলে দিল, যাকে রাতে শুতে বলেছি তাকে সব বলা আছে। বোঝো ঠেলা যাকে রাতে শুতে বলেছে সে তো আসবে রাতে, সারাটা দিন কুকুরটা তো একা, এভাবে হয় নাকি? আমি বুঝলাম কুকুরটার তো মহা প্রবলেম, তাই রেখে এলাম ক্রেশে।

এতকিছু আমি ভাবলাম করলাম কিন্তু তুমি যদি জিগ্যেস করো ঠিক কেন আমার কষ্ট, আমি বলতে পারব না। কুকুরটা তো আমার পোষা নয় যদি মরেই যেত কী আসত যেত আমার। কিন্তু আমার খুব কষ্ট হয়েছিল জানো, অনিন্দিতার জন্যেও কষ্ট হয়েছিল। একদিন মিনিবাসে করে ফিরছি, সম্ভবত পদ্মপুকুরের দিকে গিয়েছিলাম, ওনার পাশেই বসেছি, ওনার দিকে কিন্তু তাকাচ্ছি না, অথচ বুঝতে পারছি ওনার শরীর থেকে কতগুলো শেকড় বেরিয়ে এসে আমাকে আঁকড়ে ধরছে। লতাগাছ যেমন অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে। বাস থেকে নেমে ফুটপাত ধরে হাঁটছি। ওনার চোখের দিকে তাকিয়ে শুধু মনে হচ্ছে এমন কিছু বলি যাতে ওনাব মনটা ঠিক হয়ে যায়। ফুটপাতের ধারে একটা লতাগাছ বেড়ে উঠেছে, বেড়ে উঠেছে গাছটার গা ধরে, ওরা কিন্তু পরস্পরের বন্ধু, এই কথাগুলোর কী মানে বের করেছিল কে জানে! একদিন দুপুরবেলায় ফোন করে আমায় ডাকল, সেদিন ওনার বাড়িতে কেউ নেই, একথা সেকথার পরে আমার হাতে একটা কনডোম ধরিয়ে দিয়েছিল। আমি সেদিন চলে এসেছিলাম, যখন সিঁড়ি ধরে নামছি একবারের জন্যে পেছনে তাকিয়েছিলাম দেখলাম প্রচণ্ড একটা আক্রোশ নিয়ে তাকিয়ে আছে। আমার শুধু একটা কথাই মনে হয়েছিল অনিন্দিতা একা নয়, একা মানুষের চোখে ওরকম আক্রোশ থাকতে পারে না। ওনার ওই যে চোখ নামিয়ে নেওয়া ওটা লজ্জায় নয়, ওটা প্রেম নয়, বলতে খুব খারাপ লাগছে তবুও বলি ওনার দিকে কোনও পুরুষ তাকালে উনিও যখন পুরুষটিকে দেখেন তখন উনি একটা ল্যাংটো

পুরুষমানুষ দেখতে পান...

রিমি বুঝতে পারছে সুব্রতর কথাগুলো। অনিন্দিতামাসি আসলে মহিলা রোহিত ভাটনগর। রিমি বুঝতে পারছে সুব্রতর সঙ্গে তার অ্যাফেয়ার নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন অনিন্দিতামাসির। কিন্তু মা কী জানে? জানলেও কী বুঝবে রিমির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিন্দিতামাসি মাকে যে এত সচেতন করতে চাইছে সেটা আসলে হিংসে মেটানো। আমি যাকে পাইনি রিমি তাকে পাবে কেন, এটাই ব্যাপার। মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা এমনই বিচিত্র? এমনই ভয়ঙ্কর? মার বন্ধু তার মাসিই তার প্রতিদ্বন্দ্বী! আর দায়িত্বশীল অভিভাবকের মুখোশ পরে মাকে ভড়কে যাচ্ছে। এই মুখোশটা তো খুলে দেওয়া দরকার। কথাটা বলল রিমি।

সুব্রত হাসল। বলল, এই যে অনিন্দিতা সম্পর্কে এত কথা বললাম তার মানে এই নয় যে ওর মুখোশটা আমি খুলে দিতে চাই, আমি কারুর মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্যে এই পৃথিবীতে আসিনি।

—তাহলে কী জন্যে এসেছেন? বেশ জবাবদিহির ঢঙে জিগ্যেস করল রিমি।

—এ ক'দিন আমার সঙ্গে মিশে তুমি বুঝতে পারনি।

বালিকার রাগ নিয়ে রিমি বলল, না।

সুব্রত ওর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসে। বলে, সেদিন গঙ্গার ধারে আমি যে প্রকৃতির বর্ণনা দিচ্ছিলাম তোমার মনে পড়ে?

—হ্যাঁ। রাগ পড়ে গিয়ে রিমির ভিতরে এখন অন্য আবেগ। বলল, শব্দ মানে বলা কথা যে-ছবি হতে পারে সেদিনই বুঝলাম

প্রথম।

—তুমি শুনতে-শুনতে এতটাই মোহিত হয়ে গিয়েছিলে যে বলেছিলে আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো নিয়ে লিখি না কেন, মানে কবিতা বা গল্প বা এসব কিছুই না, যেভাবে বলছি সেভাবেই লিখে রাখি না কেন, বলেছিলে মনে পড়ছে?

—কেন মনে পড়বে না! একটু অবাক হয় রিমি।

—আমি কথা ঘোরানোর জন্যে আইসক্রিমওলাকে ডেকে দুটো আইসক্রিম দিতে বললাম মনে আছে?

—হ্যাঁ।

—আমি বলেছিল'ম আমার বর্ণনা দিয়েই সুখ হয়ে যায়, মনে আছে?

রিমি অধৈর্য হয়ে বলল, হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন হয় জানো?

—না।

—আসল ব্যাপারটা কী জানো ধারণ করা। এই যে তুমি ফ্যাশান ডিজাইনার, সুন্দর কিছু দেখলে, তা মানুষই হোক কি প্রকৃতি, সেটাকে তুমি ফ্যাশান ডিজাইনের মধ্যে ধারণ করলে, যে লেখে সে লেখায় ধারণ করল, যে ছবি আঁকে সে ছবিতে ধারণ করল, আমি তেমনি ভাবনায় ধারণ করি, আমি জানি আমি যেভাবে চারপাশটাকে দেখি অনেকেই অতটা অনুপুঙ্খভাবে দেখতে পারে না। আমার দেখাটা এত গভীর যে সেটাকে লিখে রাখতে হয় না, এঁকে রাখতে হয় না, কারুর লেখা পড়লে, কারুর আঁকা ছবি দেখলে, কারুর গান শুনলে যেমন তার দেখাটার সন্ধান পাওয়া যায় তেমনই

আমি আমার ভাবনাটাকে খুলে ফেললে আমার দেখাটাকে দেখতে পাই, আমি বুঝতে পারি আমার জীবন থেকে একটা কিচ্ছু হারিয়ে যায়নি, আমার শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত যা দেখেছি সবটাই ধারণ করে রেখেছি...

রিমি প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে বলে উঠল, সেটা আমি বুঝি, আপনি বোঝেন?

সুব্রতর দুটো চোখে মুহূর্তের জন্যে একটা আলো জ্বলে উঠেই হারিয়ে গেল।

রিমি বুঝতে পারল এতক্ষণ কথা বলাব মধ্যে এই প্রথম সুব্রতকে একটু হলেও চমৎকৃত করেছে, একটু অবাক করতে পেরেছে। রিমি বলল, সেটা কবে বুঝলাম বলুন তো? সেদিন বাসে করে ফেরার সময় যখন আমার থুতনির ওপরে তিলটাব কথা বললেন, আমি বুঝেছিলাম এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে কোনওটাই যেন আপনার নজব এড়ায় না, সবকিছুকেই আপনি ধারণ করে রেখেছেন, আর সেই ধারণ করার মধ্যে আমিও আছি....

—তার মধ্যে তুমিও আছ! একটু কৌতুক করে কথাটা বলল সুব্রত।

রিমি বলল, আপনি আমায় শুধু ধারণই করেননি, লালনও করেন।

সুব্রত হেসে ফেলে বলল, আমি তো বুঝতে পারছি না, কে কথা ভালো বলে, আমি না তুমি!

—সে আপনি যাই বলুন, আপনি যে আমায় লালন করেন তার প্রমাণ চন্দনবাটা।

—চন্দনবাটা?

—কেন আপনি বললেন না আমার থুতনির তিলটার ব্যাপারে চেতলার এক কবিরাজমশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, উনি বলেছেন স্নানের পরে রোজ শ্বেতচন্দনের বাটা লাগালে ধীরে-ধীরে তিলটা মুছে যাবে। আমার তিল আমায় অসুন্দর করেছে তাতে আপনার কী, তাও তো আপনি এত খোঁজখবর করেছেন! তার মানে তো আপনি শুধু মনের মধ্যে আমায় ধারণই করেননি লালনও করেন।

অদ্ভুত এক আলোকময় চোখে অথচ বোবা হয়ে রিমির দিকে তাকিয়ে থাকে সুব্রত।

রিমি বলে, মা জানেন তো ঠিক এটাই চায়। বাবা একটু ধারণ করুক ভাবনায়, তার ছোটখাট বিষয়ের ওপরে নজর রাখুক, অথচ সেটাই আমি পাচ্ছি আপনার কাছ থেকে আর মা সেটা সহ্য করতে পারছে না! আর এটা নিয়ে আপনি তো কোনও প্রতিবাদ করতে চাইছেনই না, উলটে আমায় আপনার কাছে আসতে বারণ করছেন! কিন্তু কেন!

সুব্রতর মুখের ওপর থেকে সব আবেগ মুছে গেছে এখন।

কী বোঝাবে রিমিকে। থুতনির ওপরে ওই ছোট তিলটাকে অত মন দিয়ে না দেখলেই বোধহয় ভালো ছিল। এখন মনে হচ্ছে ওই দেখাটাই যত গন্ডগোলের মূলে। কুকুরছানা-কালোগোলাপ এসব নিয়ে তো বেশ ছিল, একটা মেয়ের থুতনির তিল দেখতে গেল কেন! হেসে বলল, তাহলে এখন তুমি ঠিক কি করতে চাও?

—ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাই।

—বাড়ি থেকে? তারপর?

—আপনার সঙ্গে থাকব।

—আমার সঙ্গে! কোথায়! এখানে!

হো-হো করে হেসে উঠল সুব্রত। বলল, জানো রাতে এ-ঘরে ছুঁচো ঘুরে বেড়ায়, বাইরের নর্দমার দিকে একটা ঝাঁঝরি ভেঙে গেছে সারাতে পারছি না, আমার তো রোজগার বলতে কিছু নেই, বাবার বাড়িতে থাকি আর দাদাদের হোটেলে খাই, হাত খরচার টাকা বউদিরা দেয়...

রিমি লক্ষ করল কথাগুলো বলার সময় চোখের পাতা দুটো কীরকম কেঁপে গেল সুব্রতর। কোথায় যেন কষ্ট হচ্ছে। রিমি বলল, চাকরি না করেও আমি এখন যা রোজগার করি তাতে দুজনের চলে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

শান্ত স্বরে কথা বলতে অভ্যস্ত যে সুব্রত তার গলা চড়ে গেল। বেশ উঁচু স্বরে বলে উঠল, কী বলছ কি! তোমায় দুবার ফোন করেছি কেন জানো? তুমি যাতে কোনওভাবেই আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা না করো সেটা বলার জন্যে।

—কিন্তু কেন!

—দেখো তোমার মোবাইলে তোমার মায়ের পাঠানো এস.এম.এস.-টা আমি বুঝি। কিন্তু আজ সকালে শুভেন্দু যখন ফোন করে বলল আমি বুঝতে পারছি খুব গভীর কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে তুই রিমির সঙ্গে মিশছিস না, আমার মেয়ের তো আমার মতোই খরচার হাত আর তুই তো খরচে লোকের সঙ্গে জুড়ে যেতে ভালোবাসিস ব্যাপারটা আমি বুঝি, কিন্তু সকলে তো আর সেটা

বোঝে না, এক-একজন এক-একরকমের মানে বের করে বুঝেছিস তো..., তখন আমি শুধু অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম, শুধুই অবাক, আমার একটুও রাগ হচ্ছিল না, দুঃখ হচ্ছিল না, শুধু অবাকই হচ্ছিলাম জানো।

শুভেন্দুকে তখন কোনও উত্তর দিতে পারছিলাম না। সুব্রত বলতে পারছিল না কাঠবেকার হয়েও কাল রিমির সঙ্গে বেরিয়ে দুশোটা টাকা খরচ করেছে।

শুভেন্দু বলেছিল, তুই যদি বলিস তোকে মাসে-মাসে আমি কিছু দিতে পারি।

রাগে বোবা হয়ে গিয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল সুব্রত।

তখন সুব্রতর কথাগুলো রাগ দিয়ে কেটে দিচ্ছিল বলে জানতে পারেনি শুভেন্দু ফোনে ঠিক কি বলেছে। এখন জানতে পেরে রিমি অবাক হয়ে বলল, বাবা আপনাকে এসব কথা বলেছে!

সুব্রত হাসল, বলল, এখন বুঝতে পারছ কেন আমার কাছে আসতে বারণ করছি তোমায়।

রিমি শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সুব্রতর দিকে।

সুব্রত বলল, এখন লোক বলে মাতাল, ভবঘুরে, অকর্মার ঢেঁকি, তোমার সঙ্গে থাকতে শুরু করলে বলবে সুব্রত এখন সংসার পেতেছে নতুন চাকরি পেয়ে, কীসের চাকরি না প্রেম করার চাকরি, কাজ কি? না প্রেম করা আর তার বিনিময়ে জীবন-যাপনের খরচা তোলা। সুব্রত বলতে থাকে। আর হাসতে থাকে।

ওই হাসির প্রতিটা ধ্বনি রিমির গলার ভিতরে কাঁটা ফুটিয়ে দিচ্ছে। অদ্ভুত একটা কষ্ট দলা পাকিয়ে উঠে আসছে গলার কাছে।

কতদিন পরে একটা মনের মতন মন পেয়েছিল, চোখের মতো চোখ, যে-চোখের দৃষ্টির জন্যে তার কতকালের অপেক্ষা ছিল, সেটা তার কত কাছে, অথচ কিছুতেই ছুঁতে পারছে না। এত স্বল্প দূরত্বে জীবনের প্রথম মনের মতো একটা মন বসে আছে অথচ যেন কত দূরে। স্বল্প ব্যবধানে জটিলতার কত কাঁটাঝোঁপ।

সুব্রত হাসল রিমির চোখে চোখ রেখে, বলল, আমি জানো তো তোমার বাবার এই কথাগুলোতে খুব একটা কষ্ট পাইনি যতটা পেয়েছি অন্যকথা ভেবে।

—অন্য কথা?

—ওই যে তোমায় বললাম না, শুভেন্দুর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের ওপরে, এই এতগুলো বছর ওর সঙ্গে মিশতে পেরেছি কেন জানো...

কোনও উত্তর দিল না রিমি। তার বুকের ভিতরে একটু-একটু করে নদীর পাড় ভাঙছে। হাঁ করা রাক্ষসের মতো নদী তেড়ে এসে পাড়কে গিলে নেয় না! ছলাত-ছলাত জল অদৃশ্য শিকড়ের মতো স্থলভাগের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। আর পাড়ের ওপরের ঘরবাড়ি যা মুহূর্ত-কয়েক আগেও ছবির মতো দাঁড়িয়েছিল তা একটা দ্রুতগতির লিফটে চড়ে নেমে যায় নিচের দিকে, হারিয়ে গেল জলরাশির গভীরে। তেমনই বোধহয় হারিয়ে যাবে রিমি। সুব্রতর কথাগুলোর ভিতর থেকে সেইসব অদৃশ্য শিকড়েরা বেরিয়ে এসে যেন ঢুকে পড়ছে রিমির চেতনার ফাঁকফোঁকরে।

রিমি চুপ করে আছে দেখে সুব্রত গ্লাসে হালকা চুমুক দিল। সিগারেট ধরাল। ঠোঁট সরু করে ধোঁয়া ছাড়ল। সেই ধোঁয়া সামনের

খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে হারিয়ে গেল বাইরে গঙ্গার ওপরে ভেসে থাকা কুয়াশা মাখা অন্ধকারে। সুব্রত বলল, আমায় আবার তোমার বাবার পরিচিত এমন অনেকেই বলে আমাদের বন্ধুত্বটা এত বছর চলছে তার কারণ তোমার বাবা ব্যাঙ্কের উচ্চচাকুরে আর আমি কাঠবেকার, মাঝখানের সেতুটা নাকি কবিতার, আমি কিন্তু কোনওদিনই কথাটাকে গুরুত্ব দিইনি, তোমার বাবার সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশেছি, পরে কি মনে হয়েছে জানো ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আসলে রূপ আর রূপকারের, ও যেটা ভাবে, লেখে, আমি সেটা জীবনে রূপ দিই...

রিমি অবাক হয়ে বলল, জীবনে রূপ দেন?

সুব্রত হাসল, শুধু চোখে, বলল, তুমি তোমার বাবার লেখা পড়েছ?

এবার রিমি একটু অস্বস্তিতে পড়ল। বাবার লেখা সে বিশেষ মন দিয়ে পড়েনি। কিছু কবিতা পড়েছে। গল্প পড়েছে কয়েকটা। বিশেষ বুঝতে পারেনি। তবে এটাই ঠিক বাবার লেখা না পড়ার একমাত্র কারণ নয়। রিমির পড়ার অভ্যাসটা ক্লাস টেন পেরিয়ে যাওয়ার পরে পড়ার বাইরে ছিল না।

সুব্রত অবশ্য রিমির অস্বস্তিটাকে খুব একটা নজর করল না, বলল, যদি ভালো করে পড়ো বুঝবে বিমূর্ত প্রেমের কি অদ্ভুত সব উপস্থাপনা আছে তোমার বাবার লেখায়, এই আকাশ, ওই গাছের পাতা, পথের ধুলো এসবের কি অসাধারণ উপস্থিতি, আমি তো কবিতাগুলো পড়ে মজে গেছি শুভেন্দুতে, বুঝেছি কেন এতবছর যোগাযোগ রয়ে গেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু আজকের ফোনটা

পাওয়ার পরে বুঝলাম আমি ওকে যতটাই বুঝি যাই বুঝি না কেন ও আমায় বোঝেনি একটুও, ও কী করে বলল বলত যে হঠাৎ করে এই বয়সে এসে পয়সা রোজগারের দরকার পড়ে গেল আমাব!

—বাবা এসব কথা বলেছে! সুব্রতর কাছ থেকে প্রত্যাখিত হওয়ার আশঙ্কা, জীবনে এই প্রথম মনের মতো মন পাওয়া. আবার পেয়েও হারানোর যে কষ্টটা ভিতরটাকে ছেয়ে রেখেছে সেটা যেন এবার একটু সরে গেল। বাবা এসব বলতে পারে ভাবতেই পারছে না রিমি। বাবার মুখে কত ভালো-ভালো কথা শুনেছে মানুষটার সম্পর্কে। তার মানে মানুষটাকে একটুও ভালোবাসে না। তার বন্ধু কত ভালো শুধু সেটা বোঝানোর জন্যে ওই ভালো-ভালো কথা।

সুব্রত বলল, জানো আমি শুভেন্দুকে কিছুতেই বলতে পারছি না—তুই কোনও ভুল কথা বলছিস না, আমাকে ভুল ভাবছিস তাও নয়, আসলে তুই, তোর কবিতা, মানে তোব সমস্তটাই ভুল, তুমি বিশ্বাস করো রিমি কথাগুলো বলতে আমার খুব ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারছিলাম না, কেন জানো? তখন আমি একটা অন্য ব্যথায় ভিজে যাচ্ছিলাম, একটা ভুল মানুষের সঙ্গে এত বছর মিশলাম! একটুও চিনতে পারেনি, তার মানে আমিও তো একটা ভুল মস্ত এক ভুল..ও একবারও বুঝতে পারল না ও কবিতায় যা লিখেছে আমি বেঁচে থাকায় সেটা করার চেষ্টা করেছি! ওই যে কুকুরছানাটাকে ক্রেশে রাখতে গেছি, কালোগোলাপের খোঁজ করেছি এর মধ্যেই জীবনটাকে ঢেলে দিয়েছি—সেটা তো আসলে ওর কবিতা, ও একটুও বুঝল না!

রিমি বুঝতে পারল কুকুরছানা কালোগোলাপের পরে তার থুতনির তিলটার কথাও বলত সুব্রত কিন্তু বলল না তার শুনতে খারাপ লাগবে বলে। এখন আর জীবনে প্রথম পাওয়া সুন্দর বস্তুটা হারানোর ব্যথাটা খুব গাঢ় ভাবে নেই। উলটে যে মানুষটার প্রতি একটা ভেজা-ভেজা মন ছিল, তার উদ্দেশ্যেই একটা রাগ উঠে আসছে রিমির ভিতরে। রিমি একটু রুক্ষ্ম কণ্ঠেই বলল, তার মানে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি? আপনি একটা জ্যান্ত কবিতা! হরিবল! মাই গুডনেস!

রিমির এত বিস্ময় প্রকাশে ক্ষুব্ধ হল না সুব্রত। প্রশান্ত হাসি হাসল। বলল, যদি বলি তুমি যা বলছ ঠিক তাই...

রিমি থতমত খেয়ে গেল। অন্য মন খুঁজতে গিয়ে মনের মতো একজন কাউকে খুঁজতে গিয়ে এ সে কী অদ্ভুত জিনিসের দেখা পেল! কবিতার এরকম হাত-পা চোখ মাথায় চুল থাকে নাকি! আরও রেগে বলে উঠল, আপনার দাঁড়ায় তো?

--মানে! সুব্রতর মুখ থেকে যাবতীয় প্রশান্তি মুছে গেছে এই মুহূর্তে। কানের লতি দুটো একটু একটু করে গরম হয়ে উঠছে। ওই 'মানে'টা ছাড়া আর কিছু বলতে পারল না সুব্রত!

এইসব কিছুকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে রিমি বলল, বুঝতে পারলেন না আমার প্রশ্নটা, বলছি আপনার শরীরে কোন উত্তেজনা আছে?

আবার প্রশান্তি ফিরে এল সুব্রতর চোখে-মুখে। হাসল। বলল, যে অন্য ধরনের মন একটা তুমি খুঁজছ, ভাবো তোমার নিজের মনটাও অন্যরকমের, তুমি জানো না তোমার অবচেতনে

এই নিয়ে তোমার একটা গর্বও আছে, তার থেকেও বড়কথা কি বলত? তুমি জানো না তোমার মনও আর পাঁচজনের মতো, বোকা-বোকার হদ্দ...

কেটে দিল সুব্রতকে, ঝেঁজে রিমি বলে উঠল, বোকার হদ্দ মানে!

—এই যে প্রশ্নটা করলে না আমার উত্তেজনা এলে শরীরটা ঠিকঠাক পালটায় কিনা, বোকা বলেই তো করলে, সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না কেন, আমার শরীরটা এখনও সজাগ না হলে তোমার বাবা-মা কি তোমাব সঙ্গে কেন মিশছি তা নিয়ে চিন্তা করত?

আবার একবার গেলাসে চুমুক দেয় সুব্রত। একটু শব্দ করেই হাসে। বলে, সেসব কথা আর তোমায় বলতে চাই না, শুভেন্দু জানে...

রিমি লক্ষ করে তাকে ঘিরে সুব্রতর চোখে যে ক্ষীণ ব্যঙ্গটা লেগেছিল সেটা কখন যেন ঝরে গেছে। সেখানে অদ্ভুত এক উদাসীনতা। বাইরে আদিগঙ্গার ওপরে যে পৌষের কুয়াশা ভেসে আছে তা যেন জানলা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরে। আর মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে আছে সুব্রতর চোখের পাতায়। বলল, তোমার বাবা জানে জীবনে প্রথম খেলার ফসলটাকে আমি কী যন্ত্রণার সঙ্গে বিসর্জন দিয়েছি...

—প্রথম খেলার ফসল? বিসর্জন দিয়েছেন!

রিমির অবাক প্রশ্ন শুনে সুব্রতর চোখ থেকে উদাসীনতা সরে গেল। হাসল। বলল, খেলা নয়? এই যে তুমি ভাবলে আমি

অক্ষম, আমার পৌরুষ নিয়ে প্রশ্ন তুললে, আসলে ওটাও তো একটা খেলা, গঙ্গার ধারে বসে তোমাকে যে প্রকৃতি শোনাচ্ছিলাম সেটাও তো একটা খেলা, তার সঙ্গে জানো তো সব খেলাই খেলেছিলাম, তোমার সঙ্গে তো সব খেলা খেলিনি, তার সঙ্গে খেলেছিলাম...

রিমি বেশ কৌতূহল নিয়ে জিগ্যেস করে ফেলল, তার নাম?

গালের দাড়ি চুলকে সুব্রত হাসে, নাম জেনে কী হবে! নামটা উচ্চারণ করলে সেই তিরিশ বছর আগের ঘটনাগুলো একটা-একটা করে আবার সামনে এসে দাঁড়াবে...।

রিমি কী বলবে বুঝতে পারছে না। সুব্রত এখন কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। রিমি বুঝতে পারছে সুব্রতর খুব কষ্ট হচ্ছে। আর রিমি এটাও বুঝতে পারছে রাগ প্রকাশ করা, মানুষটাকে প্রশ্ন করার তাগিদটাও তার ভিতরে কীরকম যেন থেমে যাচ্ছে।

সুব্রত বলল, সেই খেলার ফসলটাকে জীবনে রক্ষা করা সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেওয়া যে কত কঠিন বুঝেছিলাম তখন, তখন তো কিছুই করি না, কফিহাউস, পত্রিকা—এসব নিয়েই থাকতাম, বয়স তখন কম, দাদারা তো আর তখন ভাবেনি যে ভাই কিছুই করবে না তাই এখনকার মতো তখন ওদের কাছ থেকে টাকাপয়সা পাওয়ার ব্যাপার ছিল না। এই বাড়িতে ঘর পাব তাই ভাবতে পারতাম না তখন, কোথাও নিয়ে গিয়ে তাকে তুলব সেই উপায়টাও ছিল না...

রিমি লক্ষ করল সুব্রতর চোখের কোণাগুলো কীরকম

ভিজে উঠেছে। সুব্রত দু-হাতের কবজি ঘষে নিল চোখের কোণে। পিটপিট করল চোখের পাতা। স্বাভাবিক হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেও স্বাভাবিক হতে পারল না। বলল, ভালোবাসাটা সফল হল না বলে যে ভালোবাসাটা মরে গেল তা তো নয়, যদি ভিতর থেকেই ইচ্ছেটা মরে যেত তাহলে তো আমিও বেঁচে যেতাম, কিন্তু তা তো হল না...

—তাহলে! অসীম অন্ধকারের মাঝখানে কোথায় যেন এক বিন্দু আলো দেখতে পেয়েছে রিমি এমন উত্তেজনা নিয়েই যেন বলে উঠল।

হাসল সুব্রত, তুমি যা ভাবছ তা নয, এখন আর বেঁচে নেই, তখন যদি তোমার সঙ্গে দেখা হতো যে আমার সব সমস্যার ভার নিয়ে শুধু বলত তোমার আর কোনও কাজ নেই, আমায় শুধু ভালোবাসো, তা হলে হয়তো জীবনটা অন্যরকম হতো. সে এক অসহনীয় সময় জানো...সেই রূপ দিতে না পারা কোনও আধারে রাখতে না পারা ভালোবাসাটা নিয়ে কী করেছিলাম জানো?

রিমি জীবনের যাবতীয় কৌতূহল নিয়ে জিগ্যেস করল, কী!

—এই কবিতা ওই আড্ডা সেই আকাশ চারপাশের পত্রবৃক্ষ এইসব কিছুর মধ্যে ভালোবাসাটাকে ঢেলে দিলাম, ব্যাপারটা তুমি কতটা [illegible] করবে আমি জানি না আমার কাছে ব্যাপারটা ঠিক এই, এখন এতগুলো বছর পরে এই বয়সে এসে কি ভালোবাসার মুখটা আবার অন্যদিকে ঘোরানো সম্ভব? তুমিই বলো...

রিমি উত্তরে কিছুই বলতে পারল না। এরকম কোনও

মানুষের সঙ্গে এর আগে তো সে মেশেনি। কী বলবে সে? কিছুই বলতে পারছে না রিমি। কিন্তু এখন তার কোনও রাগ হচ্ছে না। কোনও কিছু না পাওয়ার কোনও কষ্ট হচ্ছে না। কীরকম যেন হয়ে যাচ্ছে ভিতরটায়। মন খুঁজতেই বেরিয়ে ছিল সে। খুঁজতে-খুঁজতে এরকম বিচিত্র এক মনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে সে কি কখনও ভেবেছিল! সাগরের বেলাভূমিতে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ করেই যেন চোখে পড়ে গেছে একটা বিচিত্র ঝিনুক। এরকম বিচিত্র ঝিনুক কিউরিও মনে করে লোকে কাচে ঢাকা শেলফে রেখে দেয়। তেমনই মনটাকে মনের শেলফে রেখে দেবে রিমি। তার অনেক না পাওয়ার মাঝখানে একটা ছোট্ট পাওয়া হয়ে বেঁচে থাকবে। সুব্রতর সিঙ্গেল খাটের কোণায় বসেছিল রিমি। উঠে দাঁড়াল। ম্লান হেসে বলল, আপনি যখন চান না আমি আর আসি তখন আমি আসব না, কিন্তু একটা অনুরোধ আছে...

—কী?

—ফোন করলে কিন্তু ধরবেন, কেটে দেবেন না কিন্তু...

উত্তরে সুব্রত কিছু বলল না। শুধু হাসল। এমন স্নিগ্ধ হাসি বিশেষ দেখেনি রিমি। খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছে না একটুও। তবুও ফেরাতে হল রিমিকে।